ষাণ্মাসিক

অর্কিব

ISSN 2319-[illegible]

দ্বিতীয় বর্ষ । তৃতীয় সংখ্যা । ২০১৮

আর্জব

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির এক নবদিগন্ত

(ষাণ্মাসিক)

সম্পাদক

মহাদেব রায়   মিঠুন দত্ত   রঞ্জিত বিশ্বাস

আর্জব গবেষণা পরিষদ

ই-১৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং - ৭৩৪০১৩

ARJAB

BHASA SAHITYA SANSKRITIR EK NABO DIGANTA

Published by Arjab Gabesana Parisad 2012

ISSN : 2319 - 1287

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

২৫ শে ডিসেম্বর, ২০১২

প্রকাশক

আর্জব গবেষণা পরিষদ

ই-১৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং-৭৩৪০১৩

দূরভাষ - ৯৬৪১০২৭৯৭৮

প্রচ্ছদ

ড. নিখিলেশ রায়

বিভাগীয় প্রধান

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ও

ডাইরেক্টর, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড কালচার্স,

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাপ্তিস্থান

প্রতিভাস্বর, বুকস অফ ইউ .

রাইটার্স পেন ইমপ্রেশন (শিবমন্দির, শিলিগুড়ি), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (কোলকাতা)

অক্ষরবিন্যাস

তনয়া সরকার ও বুদ্ধকুমার বর্মন

মুদ্রণ

সরকার'স ইম্প্রেশন, শিবমন্দির

বিনিময়

৭৫ টাকা মাত্র

— ঃঃ সূচিপত্র ঃঃ —

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ভাষার পত্র-পত্রিকা ● নিখিলেশ রায় ৭

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ● রবিন পাল ১২

রবীন্দ্র নাটকের প্রেক্ষিত ও স্বরূপ ●বরুণ কুমার চক্রবর্তী ১৬

শ্রেণী বৈষম্যের নিরিখে রবীন্দ্রচেতনায় ব্রাহ্মসমাজ ●রঞ্জিত বিশ্বাস ২২

আশাপূর্ণা দেবী : খুঁজে পাওয়া পথ ●নিবেদিতা গুহ ২৯

মানকুমারী বসু : জীবনজিজ্ঞাসা জীবনবোধ ●এ. টি. এম সাহাদাতুল্লা ৩৩

সংকট মুহূর্তে বাংলা ভাষা : একটি সমীক্ষা ●অধীর কুমার সরকার ৪০

জনজীবনে উপভাষার গুরুত্ব ●বাসুদেব সরকার ৪৫

সমরেশ বসুর ছোটগল্প : প্রসঙ্গ মানবিকতা ●সহদেব রায় ৪৭

যৌনতার স্বরূপ : প্রসঙ্গ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প ●বিপ্লব কুমার সাহা ৫১

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ ছোটগল্প ●গৌতম মণ্ডল ৫৮

জগদীশ গুপ্তের গল্পে বারবণিতা ●মৌসুমী সিংহ ৬০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বিষয় স্বরূপ একটি খসড়া ●তিলক সরকার ৬৬

প্রাসঙ্গিকতায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ● অর্পণ রায় প্রামাণিক ৬৯

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত : প্রকৃত সত্তার অন্বেষা ● কুন্তল সিনহা ৭৫

কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পে গানের ভূমিকা ● গোপেশ রায় ৮১

কবি অরুণ মিত্র : কালচেতনা ও শিল্পশৈলী ●চিত্রা সরকার ৮৯

চেনা মনসায় অচেনা লক্ষ্মী ●মিঠুন দত্ত ৯৪

রবীন্দ্রগানে লোকসংস্কৃতির উপাদান: প্রসঙ্গ 'সোনারতরী' ●সুশান্ত কুমার সরকার ১০০

মানকুমারী বসু : জীবনজিজ্ঞাসা জীবনবোধ

এ. টি. এম সা হা দা তু ল্লা

উনিশ শতকে বাঙালী জীবন যে সব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আলোড়িত হয়েছিল মেয়েদের সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা তার মধ্যে অন্যতম। একদল চাইছিলেন পরিচিত পরিমণ্ডলের বাইরে বার করে এনে মেয়েদের জীবনের নতুন ভাষ্য রচনা করতে। অন্যদলের চোখে বিষয়টা প্রতিপন্ন হয়েছিল ঘোর অনাচার রূপে। সবমিলিয়ে বিতর্কের শেষ ছিল না। এই বিতর্ক-যজ্ঞের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অবশ্যই পুরুষরা। তবে মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেননি। বিভিন্ন সময় এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন সামনের সারিতে। কথা বলেছেন নিজেদের মতো করে। মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) এইরূপ অগ্রসর বঙ্গললনাদেরই একজন। আমাদের প্রশ্ন এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিক অবস্থান সম্পর্কিত।

মেয়েদের অধিকারের প্রশ্নে মানকুমারীর ব্যক্তিগত অবস্থানের মধ্যে একটা নিজস্বতা ও মৌলিকত্ব রয়েছে। যারা মনে করেন নারী ও পুরুষের অবস্থান একই সারিতে হওয়া উচিত মানকুমারী তাদের সঙ্গে সহমত নন। মেয়েদেরকে তিনি দেখতে চেয়েছেন এমন একটা সামাজিক ভূমিকায় যেখানে তারা পুরুষের সহযোগী মাত্র। এক্ষেত্রে কোনো রকম প্রতিযোগিতার সম্পর্ক তিনি স্বীকার করতে চাননি। দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, মেয়েদের কাজ করতে হবে পুরুষের ছত্রছায়ায় থেকে — "জগতে প্রায় সকল সভ্য জাতির সমাজে দেখা যায় যে পুরুষজাতি বহির্ভাগ ও স্ত্রীজাতি অন্তর্ভাগ রূপে অবস্থিত। শরীরবিজ্ঞানবিদ্ অথবা সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এইরূপ পার্থক্য অনুমোদন করেন। এইজন্য পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ।" (বিগত শতবর্ষে ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০১)। যে সমাজে নারী ও পুরুষ একই শ্রেণিতে অবস্থান করেন তিনি সেই সমাজকে নিন্দা করেছেন — "স্ত্রী যে সমাজে অন্তর্ভাগ ও পুরুষজাতি বহির্ভাগরূপে অবস্থিত, সেই সমাজই প্রকৃত উন্নত সমাজ। যে সমাজে ইহার অন্যথা, সভ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও সে সমাজকে উন্নত সমাজ বলা যায় না, প্রকৃত পক্ষে তাহা বিকৃত সমাজ।" (ঐ)

মেয়েদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কিত মানকুমারীর এই অবস্থান বিতর্কিত। অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন না। তথাপি তাঁর বক্তব্য বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। অধিকার কথাটির একটা নিজস্ব সংজ্ঞা রচনা করে নিয়েছিলেন তিনি। অধিকার মানে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ। যে সামাজিক পরিবেশ মেয়েদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক তার বিরুদ্ধে মানকুমারীর লড়াই। পুরুষের বহু বিবাহ প্রথার ঘোর বিরোধী তিনি। এতে মেয়েদের অপমানের চূড়ান্ত হয়। এমন অপমানিত অপদস্থ অবস্থায় ব্যক্তি কখনো তার সামাজিক কর্তব্যে স্থিত থাকতে পারেন না। সামাজিক কর্তব্যবোধে উদ্বোধিত করার জন্যেই মেয়েদের বিশেষ করে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন তিনি। যে সমাজে মেয়েরা তাদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত তাকে সুস্থ সুন্দর সমাজ

মূল্য স্বীকার করতে চাননি মানকুমারী — "যে সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জীবন সুশিক্ষাধারায়, নিজ কর্তব্য পালনে উপযুক্তভাবে গঠিত, জগতে সেই সমাজই সম্পূর্ণ। এই হিসাবে ভারতীয় সমাজ বড়ই অসম্পূর্ণ ...।" (বিগত শতবর্ষে ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০১)।

পুরুষের সঙ্গে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে না, মেয়েরা তাদের নিজস্ব ছন্দে নিজেদেরকে রচনা করবে এমনটাই ভাবতেন মানকুমারী। মেয়েদের জীবন চর্চা সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। কবিতা লিখে, সঙ্গীত চর্চা করে কিম্বা প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে মেয়েদের অবসর সময় যাপনের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি — "সুরুচিপূর্ণ কবিতা যে মানবের বিশুদ্ধ আমোদের এক প্রধান উপকরণ, একথা বোধহয় অনেকেই জানেন। ইহা পড়িতে যেমন আনন্দ, লিখিতেও ততধিক। ইহা রমণীর উপযোগী। ... যাহারা নিজে লিখিতে না পারেন, তাঁহারা কোনো সুকবির রচিত বিশুদ্ধ কবিতা সখীগণের নিকট আবৃত্তি করিলেও অনেক তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। যিনি পারেন তিনি সুরুচি সুমিষ্ট বিশুদ্ধ কবিতা লিখিবেন।" (স্ত্রীলোকের নির্দোষ আমোদ, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০২)। ছবি আঁকা মেয়েদের মানসিক আনন্দের একটা বিরাট ক্ষেত্র। মানকুমারী দুঃখ করেছেন আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে ছবি আঁকার চল না হওয়ায় — "কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে স্ত্রী জাতির মধ্যে এ বিদ্যা প্রচলিত হয় নাই। চিত্র বিদ্যা ও ফটোগ্রাফি করিতে শেখা স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রচলিত হইলে বড়ই সুখের হয়।" (ঐ) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ফটোগ্রাফির উপর এত গুরুত্ব দিলেও নৃত্যশৈলীকে তিনি খুব সুনজরে দেখেননি — "নৃত্য সঙ্গীতের অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু এ দেশে যে রকম নৃত্য প্রচলিত তাহা আমরা রমণীকুলের উপযোগী বলিতে পারি না।" (ঐ)

আমাদের পারিবারিক জীবনে মেয়েদের ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানকুমারী জানিয়েছেন — "গৃহিণীকে লেখা পড়া, আবশ্যক ব্যবহার্য সেলাই, ধাত্রী বিদ্যা, শিশু পালন, গৃহচিকিৎসা, আহার্য দ্রব্যের গুণাগুণ এবং দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব জানা কর্তব্য।" (নব্যগৃহিণী, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৫) এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও জানাচ্ছেন — "গৃহ যাহাতে ধর্মালোকহীন শ্মশান না হয়, তদ্বিষয়ে গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহের প্রতিজনের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে তিনি যত্নবতী হইবেন। সকলের পক্ষেই তিনি হিতকারিণী, প্রফুল্লমুখী ও স্নেহময়ী দেবীরূপা হইবেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, আপনাকে গৃহের-গৃহাশ্রমের নেত্রী জানিয়া গৃহিণী নিজ কর্তব্য পালন করিবেন" (ঐ)। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রে মেয়েদেরই দায়িত্ব নিতে হবে বিশেষ করে — "যদি স্বামী দুশ্চরিত্র হন, তাঁহার মন যদি সংকীর্ণ হয়, তবে যাহাতে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, রমণী তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন। ... যে রমণী প্রতির গন্ধ হৃদয় কোমলতায় — এমন মধুরতাময় করিতে পারেন, তিনি পূজা পাইবারই উপযুক্ত, তিনি দেবী, তিনি প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের পুত্তলিকা। তাঁহার দৃষ্টি কত মধুর, কত আনন্দপ্রদ।" (বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৭)। যেসব মেয়েরা দৈহিক পরিশ্রম সহযোগে গৃহকর্ম পালনে অনীহা প্রকাশ করেন তাদের প্রতি মানকুমারীর তীব্র শ্লেষাত্মক উক্তাবলী রীতিমতো কানে বাজে — "শিশুর অনুরোধে

ধাত্রী, গৃহকর্মের অনুরোধে চাকরাণী তো আছেই, এবার কিন্তু যেমন করিয়াই হউক একটা রাঁধুনি রাখিতেই হইবে, নহতো রোগা বৌ দুই দিন পরেই মারা যাইবে।" (ঐ)

এসব কথা শুনতে শুনতে আমাদের মধ্যে অনেকের বিরক্তির পারদ চড়ে যেতে পারে। এত সংকীর্ণ ভাবনার মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখেন যিনি তাঁকে নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনার কী আছে। আমরা আগেই বলেছি মানকুমারী তাঁর ভাবনার মধ্যে এমন একটা সনাতনী ধরণ আছে যা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের হতাশ করতে পারে। কিন্তু এই হতাশা কখনোই তাঁর সম্পর্কিত শেষ কথা নয়। তাঁর মধ্যে রয়েছে একটা উত্তরণ যা তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত এক কোটিতে পৌঁছে দেয়। নারী পুরুষ নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ, তার সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কিত মানকুমারীর ভাব-ভাবনা আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করবে একটা বিরাট উদ্দেশ্যের কথা স্মরণে রেখে। তিনি কখনোই ভুলে যাবেন না, ভগবানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কর্তব্যের ভার বহন করার জন্যই তার এই মানবজন্ম — "মানব জগতের তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যায়, ততই অনুভূত হয় যে, সত্যধর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল কর্তব্য পালন করাই মানব জগতের উদ্দেশ্য। ... নিজের, নিজ পরিজনের, সমাজের জগতের উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা মানবের জাতিগত কর্তব্য। মানব বুদ্ধি যতটুকু বুঝিতে পারে, তাহাতে বোধহয় ঐ কর্তব্য পালন করাই ভগবানের আদেশ" (স্বার্থে পরার্থে, বামাবোধিনী পত্রিকা ১৩০০)। এমন কঠিন কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম — "ঈশ্বরদত্ত সদ্‌গুণগুলিকে সুমার্জিত ও বিকশিত করিয়া নিজের হৃদয় মন ও আত্মাকে উন্নত হইতে দেওয়াই গুণী ব্যক্তির কার্য।" (গুণগ্রাহিতা শক্তি, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৭)। এ কার্যে বাধা অনেক। মানুষ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত। প্রবৃত্তির বাঁধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা সহজ নয়। মানকুমারী আমাদের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ হল নিরন্তর চেষ্টা করে যাওয়া — "আন্তরিক প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হয় না, একবার দুইবার তিনবার বহুবার চেষ্টা করিয়াও যদি এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারি, তবে কেন চেষ্টা করিব না।" (বঙ্গমহিলার পত্র, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৫)

এমন হতে পারে অনেক চেষ্টার পরেও কৃতকার্য হওয়া গেল না। এই অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে শোক তৈরি হয়। হতাশা দানা বাঁধে। মানকুমারী এই শোক ও হতাশাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তবে এর সর্বব্যাপী প্রভাবকে স্বীকৃতি দেননি — "ভগবৎ সৃষ্ট শান্তিলাভে অবহেলা করিয়া আমরা যদি গৃহধর্ম পরিত্যাগ করি — এইসব অধর্ম ও কুপথে পথে গিয়া যদি শোকের জ্বালা জুড়াইতে চাহি, তাহা হইলে আমরা নিন্দিত, ঘৃণিত এবং মানবকুলের কলঙ্ক; নচেৎ শোকে কাতর হই বলিয়া আমরা কখনোই নিন্দিত নহি।" (শোকের শান্তি, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০১) যাবতীয় শোকের, হতাশার উৎস ব্যক্তির ছোটো ছোটো পার্থিব কামনা বাসনা। এইসব কামনা বাসনাকে জয় করতে হবে। মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করবে বিরাট বিস্তৃত কোনো সত্যের স্বপক্ষে — "স্বার্থে, পরার্থে ও জগতের হিতার্থে খাটিবার উপযুক্ত হইবার জন্যই আপনাকে বড় করিয়া গড়িব।" (উদাসিনীর সংসার, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৭) বলেছেন মানকুমারী। মানব জীবনের

উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর আর এক অনন্য উচ্চারণের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানুষ প্রকৃতির নির্দেশিত পথে পৃথিবীতে আসে, তারপর একদিন প্রকৃতির নিয়মেই চলে যায়। এই যাতায়াতের পথে ক্ষণেক থেকে যেতে হবে আমাদের। চিহ্ন রেখে যেতে হবে নিজেদের অস্তিত্বের স্বপক্ষে। এই পথেই জীবনের সার্থকতা — "এ মাটির দেহ কণে/ মিশিবে মাটির সনে/ মাটির শরীর মাটিতে মিশিবে/ বিফলে মিশিবে কেন।" (উদাসিনীর সঙ্গীত, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৭)।

সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরার জন্য ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি লড়াই করতে হয় তার নিজের সঙ্গে। আমি তোমাকে ভালোবাসি, এই সত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে আর এক সত্য — আমিও আমার ভালোবাসার প্রতিদান চাই। এই দ্বিতীয় সত্যের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার সাধনাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনা। কেননা এক্ষেত্রে চাওয়া পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকেই। এই ব্যবধান থেকে তৈরি হয় যন্ত্রণা যন্ত্রণা-দগ্ধ মানুষ একসময় সরে আসে তার নৈতিকতার জায়গা থেকে। নিজেকে ভুলে সে তখন অন্যের দোষ ত্রুটী খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আত্মিক অপমৃত্যু হয় তার। মানুষকে এমন অপমৃত্যুর পথ থেকে উদ্ধার করার পন্থা সন্ধান করেছেন মানকুমারী। ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে নিরাসক্ত নির্মোহভাবে কাজ করে যাওয়া এই পন্থা বলে তাঁর মনে হয়েছে। এ পথ নিঃসন্দেহে বন্ধুর। তবু এই বন্ধুর পথেই আমাদের হাঁটতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই — "যদি সিদ্ধি লাভের আশাশূন্য হইয়াও এই মহাব্রতসাধনায় জীবন নিয়োজিত করিতে পারি, তাহাতেও আমার মানবজীবন সার্থক হইবে। কারণ নিঃস্বার্থ নির্মল ভালোবাসার সম্প্রসারণে মানব-হৃদয় যতই সম্প্রসারিত হয়, মানব ততই বিশ্বজগতকে এবং বিশ্বপতি জগদীশ্বরকে ভালোবাসিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে ভালোবাসার সফলতা, ইহাতেই মানব জন্মের সার্থকতা।" (শোকের শান্তি) মানুষ অন্যের দোষ ত্রুটির কথা মাথায় না রেখে আত্মশুদ্ধির পথে নিজেকে মেলে ধরুক উদার বন্ধন এমনটাই চেয়েছেন মানকুমারী — "যদি রাগ করিতে হয়, তবে কি বা চাকরের প্রতি অথবা প্রতিবেশীর প্রতি কেন রাগ করিবে, মনের পাপগুলোর উপর রাগ কর, তাহাদের জন্য একটুকু স্থানও রাখিও না। হৃদয়ের সীমা বৃদ্ধি কর, উদারতার অভাব দূর হইয়া বিমল জ্যোৎস্না ফুটিবে।" (নবগৃহিনী, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৪)

মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানকুমারী প্রায় দেশ বিদেশের প্রখ্যাত সব ব্যক্তিদের বক্তব্যকে আশ্রয় করেছেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত মতবাদের বিরোধীতা করার একটা প্রবণতাও তাঁর মধ্যে দেখা গেছে —

"অগাষ্ট কোমট, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মানব জীবনের উদ্দেশ্য 'উন্নতি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিতে হয়। উন্নতি লাভের ফলও তো অনির্বচনীয় সুখ। যদিও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মানবকে অনেক সময় কঠোর আত্মদমন, ক্লেশকর আত্মত্যাগ প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখ সহ্য করতে হয়, কিন্তু কর্তব্যপালন জনিত যে স্বর্গপ্রসাদপূর্ণ অসীম সুখের তুলনায় সে সকল দুঃখ নগণ্য মাত্র। প্রকৃত পক্ষে সুখ ভিন্ন মানব মনের গতি নাই।" (শোকের শান্তি, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০৩)

তাঁর এই অভিমতকে নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, তবে এর যৌক্তিকতার দিকটি অস্বীকার করার নয়। যে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি কথাগুলি বলার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে যে একটা সত্য আছে তার মূল্য অসামান্য। সেদিনের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই স্পর্ধিত উচ্চারণ আমাদের গর্বিত করে।

মানকুমারী তাঁর জীবনভাবনা নিয়ে যেখানে আরও আমাদের গর্বের কারণ হন সে তাঁর স্বদেশিকতা, জাতীয়তাবোধ। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির গভীর অনুরাগী তিনি। ভারত-সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তাকে প্রতিপন্ন করার জন্য একটা ক্লান্তিহীন প্রয়াস রয়েছে তাঁর মধ্যে। প্রাচীন ভারত ভারতবাসী মাত্রেই গৌরবের বিষয়। মানকুমারী প্রাচীন ভারতের গৌরব কথা কীর্তন করে লিখেছেন 'আর্যমহিলা', 'বিগত শতবর্ষে ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধ। সীতা, সরমা, শৈব্যা প্রমুখের চরিত্র-ব্যাখ্যায় আলোকিত হয়েছে প্রবন্ধগুলি —

"সুমিত্রা দেবীর ধর্মভাব যে কত উন্নত ছিল ও বিশুদ্ধ ছিল, পাঠিকা ভগিনী তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। সুমিত্রা দেবীর স্থিরতা, ধীরতা, বিজ্ঞতা যে এমন দেদীপ্যমান, সে এই বিশুদ্ধ ধর্মপরায়ণতার জন্য। বিশুদ্ধ ধর্মপরায়ণতা হইতে তাঁহার দেব-বৃত্তি সকল এমন পরিস্ফুট হইয়াছিল যে তাঁহার ভার্যাত্ব, মাতৃত্ব, সপত্নীত্ব, বিমাতৃত্ব, বিমাতৃত্ব সবই মধুর-মধুরতর-মধুরতম। এ দেবী কেবল অযোধ্যার রাজরাণী হইবার উপযোগিনী নহেন, গৃহলক্ষ্মী সতীকুলের সম্রাজ্ঞী স্বরূপ। (আর্যমহিলা-সরমা, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০০)
প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল পঞ্চযজ্ঞ প্রথা। মানকুমারী এই প্রথার মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষনীয় বিষয়গুলি অনুবর্তন রয়েছে বলে মনে করেছেন —

"হিন্দু শাস্ত্রে অতিথি ও অতিথি সৎকারের যে প্রকার ব্যবস্থা আছে, তাহা উপযুক্ত রূপে আচরিত হইলে মানবের স্বার্থপরতা, অভিমান, হিংসা, বিবাদ প্রভৃতি কুবৃত্তি ও কুকার্য্য দূর হয়, পরসেবা, সহানুভূতি, দয়া, উপচিকীর্ষা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি সাধুবৃত্তি ও সাধুকার্য্য সকল অভ্যস্ত হয়, হিংসা ভালোবাসায়, শত্রুতা বন্ধুত্বে ও আত্মাভিমান বিনয়ে পরিণত হইয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। (পঞ্চযজ্ঞ, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০০)

'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাইবা' এই জীবনবোধের অনুশীলনের জন্যই বিশেষ করে আমাদের মুনিঋষিরা পঞ্চযজ্ঞ প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন বলে মানকুমারীর ধারণা — "সাধুভাব প্রণোদিত হইয়া সাধুতা অভ্যাস না করিলে সাধু বা সাধ্বী হওয়া যায় না। এইজন্য আর্য্যগণ, সর্বজনীন প্রীতি কেবল বাক্যে বলিতে না দিয়া, কায়মনোবাক্যে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন।" (ঐ)। আমাদের পূর্বপুরুষরা এমন সুন্দর এক জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন ভেবে গর্ববোধ করেছেন তিনি — "যে জাতি পঞ্চযজ্ঞের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, সে জাতি ব্যক্তি বিশেষের শিক্ষক নহেন, এই বিশ্বজগতেরই গুরু স্থানীয়।" এমন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যাদের পূর্বপুরুষ আজ তাদের চূড়ান্ত দুরবস্থা। এই দুরবস্থার কারণ হিসাবে মানকুমারী আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে নির্দেশ করেছেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যথাযথ শিক্ষা নিতে পারিনি। আমরা আমাদের ঐতিহ্যের শিকড় থেকে বিচ্যুত — "তাঁহাদের আদর্শে

অতি আমাদের সাধারণের গুণগ্রাহিতা শক্তি যদি পরিস্ফুট হইত, তাহা হইলে আমাদের উর্বর ক্ষেত্রগুলিও শস্যশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত না। আমাদের ঢাকাই মসলিনের মত অতুলনীয় জিনিস বিদেশীয় পাটশনের দৃষ্টিকে অতিগ্রাহ্য হইত না, আমাদের জেলা উঠিয়াও নিয়ম হইত না।" (গুণগ্রাহিতার শক্তি, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৭)। বোঝা যাচ্ছে মানকুমারীর জাতীয়তাবোধ কোনো সংকীর্ণতার সীমায় সীমায়িত নয়। সত্য সুন্দরের পথেই এক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা। দেশ ও জাতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য যে ভাবনা চিন্তা তিনি করেছেন তা সেদিনের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে অনন্য। অন্ধ স্বজাতিপ্রীতি নয়, না অহেতুক পরজাতি দ্বেষ। আমরা বরং আমাদের যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি তাকে দূর করব, অন্যের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীকে যথাসম্ভব আয়ত্ত করে রচনা করব জাতীয়জীবনের সোপান এই যা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা রয়েছে মানকুমারীর মধ্যে — "বিদেশীয় প্রথানে দেশের যে রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে তাহা পুনঃ সংগ্রহ আর দেশীয় দূষিত বায়ুর পরিবর্তে বিদেশীয় স্বাস্থ্যকর বাতাস গ্রহণই আমাদের অভিপ্রেত। সমাজের পরিবর্তন সময়ে প্রকৃতি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।" (নব্যাগৃহিণী, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০১)

মানকুমারী ভারতীয় জাতীয়তাবোধে দৃঢ় এক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এখানেই তাঁর চরিত্রের সীমানা নয়। সীমার মাঝে অসীমের জন্য আসন পাতা তাঁর সাধনা। তিনি একই সঙ্গে ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক —

"আমার প্রাণের প্রাণে একটি বড় সাধ আছে। একদিন এই বিশ্ব সংসারকে আমার গৃহ করিয়া এই মহাগৃহে 'গৃহধর্ম' রাখিব। একদিন বিশ্বমাতার মাতৃস্নেহ বুকে পাইয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে দিগকে 'আপনার ভাই বোন' করিব। তাহাদের কল্যাণের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু বলিদান করিব। একদিন এই দেহ, এই নশ্বর মাটির দেহ, সেই সংসারের জন্য খাটাইব। একদিন পরের অস্তিত্বে — দু এক জন নয়, আমার আত্মীয় পরিবার নয়, বিশ্ব পরিবারের অস্তিত্বে, আমার অস্তিত্ব মিশাইব। (উদাসিনীর সংসার, বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৭)

এমন করে বলতে পারেন যিনি তাঁকে কোনো জাতীয়তার বন্ধনে বেঁধে রাখা চলে না। তিনি বিশ্বমানবী। বিশ্বমানবতার পাঠ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম পাঠ্য হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করা যায় অনায়াসে।

নিতান্ত শৈশব থেকে অসামান্য এক বোধের জগতে পথ চলার অনন্যনাম মানকুমারী বসু। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সের বিধবা। ভাগ্যের হাতে সঁপে দেননি নিজেকে। মন্দ ভাগ্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামেই করেছেন জীবনের শুরু। তাঁর সময়ের কতশত বাঙালি মেয়ে যেখানে কঠোর বৈধব্য পালনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে শেষের পথে মানকুমারী সেখানে এক বিকল্প পথের সন্ধান করে নিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। এই সাফল্যের প্রত্যেকটি সিঁড়ি তিনি ভেঙেছেন সচেতনভাবে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে। আত্মজীবনীর আকারে এ বিষয়ে তাঁর বিবৃতি এইরকম —

"যখন ক্রমশঃ দিন যাইতে লাগিল, তখন কেবল গুরুজনের সেবা, শিশুপালন অথবা সংসারের কাজকর্ম করিয়া আমার মনের তৃপ্তি হইল না। বাকী জীবনটা কি করিয়া কাটাইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। ভগবান এ অধম সন্তানকে যে

বিদ্যানুরাগ ও একটু কবিত্বশক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে মনে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ববিধাতার কাজে আত্মোৎসর্গ করা উচিত। বলা বাহুল্য, তখন ভগবানের স্নেহে অবিশ্বাস বা তাঁহার উপরে আমার অভিমান দূর হইয়াছিল। আমার অদৃষ্ট ফল আমি পাইলাম, ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল।
আমি মনে করিলাম, সধবা মহিলাদিগের যেমন সংসারের কাজ করা কর্তব্য, বিধবা মহিলাদেরও সেইরূপ সমাজের কাজ করা কর্তব্য। ইহা যখন আমার 'সত্য' বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।" (আমার অতীত জীবন, উত্তরা, ১৩০১)
এত প্রত্যয়, এই দৃঢ়তা কেবল সে যুগের প্রেক্ষিতে নয় আজকের সাপেক্ষেও বিস্ময়ের। মানকুমারী তাই হতে পারেন আমাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগানোর বিষয় কবিগণ।

ভাবতে অবাক লাগে এমন বিরাট একটা প্রতিভার কথা কী আশ্চর্যরকম ভাবে বিস্মৃত হয়েছি আমরা। কবি মানকুমারী আজ কোনো ক্রমে টিকে আছেন সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায়। জীবন-সমুদ্রের দক্ষ নাবিক প্রবক্তিক মানকুমারীর অস্তিত্বমাত্র সেখানে অবশিষ্ট নেই। বাংলা ভাষা সাহিত্য পড়ুয়াদের বাইরে তাঁর নাম জানেন এমন বাঙালি নগণ্য। একটা বিরাট অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে পথ হাঁটছি আমরা। এ ভার থেকে যত দ্রুত মুক্ত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। জন্মশতবর্ষ অতিবাহিত হয়েছে অবহেলায় অনাদরে। সার্ধ জন্মশতবর্ষের কাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমরা আজও ঘুমিয়ে আছি। ঘুমন্ত বাঙালিকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে নিবেদিত হল আমাদের এই ক্ষুদ্র রচনা।

লেখক পরিচিতি : প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ISSN : 2348-3504
জুলাই ২০১৬

মীর মশাররফ হোসেন সংখ্যা

এবং সংস্কৃতি

সম্পাদক

সইফুল্লা

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

ISSN : 2348-3504

এবং সংস্কৃতি

(মননচর্চার আসর)

মীর মশাররফ হোসেন

বিশেষ সংখ্যা

জুলাই, ২০১৬

কলকাতা

প্রকাশক
মীর রেজাউল করিম
৩৮, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তলা), কলকাতা-৭০০০১৪

যোগাযোগ
চলভাষ-৯১৫৩৬৯৭১৩০, ৯৪৩২৮৮০২৪২
E.mail--samim.saifulla@gmail.com, rafakarimnbu@gmail.com.

উপদেষ্টা মণ্ডলী
অশোক উপাধ্যায়, আফজাল হোসেন, উৎপল ঝা, শান্তিবরণ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাদেক আলি খান, সুদীপ বসু, সুস্মিতা মিত্র, স্বপন বসু

সম্পাদক
সাইফুল্লা
শুভময় মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলী
অঞ্জনা মোল্লা, আনিসুর রহমান, অভিজিৎ কুমার ঘোষ, আসমতী খাতুন, গৌতম দাস, ইসমতারা খাতুন, বর্ণা বর্মন, দেবকুমার ঘোষ, প্রদীপকুমার চক্রবর্তী, মনরাজ শেখ, সুব্রত রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদ
প্রিয়ব্রত ভাণ্ডারী

অক্ষর বিন্যাস
মইনুদ্দিন মোল্লা, বনকাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

মুদ্রণ
বসু মুদ্রণ, ১৯এ শিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৪

প্রাপ্তিস্থান
বাংলা বিভাগ-আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিরাম বুক স্টল, ছোঁয়া প্রকাশনী, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্বনীড় প্রকাশন, ধ্রুব পেপার কর্নার

বিনিময়-২৫০/-

সূচিপত্র

পর্ব-১

মীর মশাররফ হোসেন : দেশ কালের কথা—সুফিয়া বেগম • ১

মীর মশাররফ হোসেন : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব—এ টি এম সাহাদাতুল্লা • ২৩

মীর মশাররফ হোসেন : স্রষ্টা ও সৃষ্টি—আমিনুল ইসলাম • ৪৩

মীর মশাররফ হোসেন : আত্মকথার আত্মাবিষ্কার—বারিদবরণ ঘোষ • ৮৬

মীর মশাররফ হোসেন : এক অভিমানী মুসলিম মনীষা—লায়েক আলি খান • ৯২

মীর মশাররফ হোসেন : মুসলমান লেখক ও মুসলমানি বাংলা প্রসঙ্গ—রতনকুমার নন্দী • ৯৯

সম্প্রীতির সেতু মীর মশাররফ হোসেন—মমতাজ খাতুন • ১১১

পর্ব-২

মীর মশাররফ হোসেন: সাময়িকপত্র সম্পাদনার আলোকে—আবুল আহসান চৌধুরী • ১১৭

সম্পাদক মীর মশাররফ হোসেন—অভিজিৎকুমার ঘোষ • ১৩৮

নাটককার মীর মশাররফ হোসেন—সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় • ১৪২

সাধারণ অসাধারণের সেতুবন্ধন মীর মশাররফ হোসেন এর নাটক—আনসারী খাতুন • ১৫১

মশাররফের পুঁথি সাহিত্য পরিপ্রেক্ষিত ও প্রবণতা—কাহান আলম • ১৭০

গদ্যশিল্পী মশাররফ হোসেন—শহিদুল্লা • ১৭৮

গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেন:ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—সুজিতকুমার বিশ্বাস • ১৮৭

পর্ব-৩

বাংলা আত্মকথার ধারায় মীর মশাররফ হোসেন এর 'আমার জীবনী'—তপন নন্দ • ১৯৩

বিষয়-নিরিখে 'বিষাদ-সিন্ধু'—হাবিব আর রহমান • ২০৫

বিষাদ-সিন্ধু: অসাম্প্রদায়িক নামাবলী—শামস্ আলদীন • ২১৬

বিষাদ-সিন্ধু: একটি নতুন পাঠ—সুব্রত রায়চৌধুরী • ২২৭

উদাসীন পথিকের মনের কথা: মশাররফ প্রতিভার একদিক—রোকসানা বুলবুল • ২৩৩

জলছবি—আশিস মুখোপাধ্যায় • ২৪২
জমীদার দর্পণ-এ পুরুষতন্ত্রের মুখ: একটি নিবন্ধের খসড়া—আমজাদ হোসেন • ২৪৯
জমীদার দর্পণ নাটকের ভাষা প্রসঙ্গে—সুমন্ত মুখোপাধ্যায় • ২৫৪
প্রাবন্ধিক মীর মশাররফ হোসেন এবং 'গো-জীবন': প্রেক্ষিত একুশ শতক—
শামসুজ্জোহা হক • ২৫৯

পুনর্মুদ্রণ

বাঙালি মুসলমানের আত্মোপলব্ধির সূচনা-'আখীজন্ নেহার'—স্বপন বসু • ২৭৭

পরিশিষ্ট

পর্ব-১

মীর মশাররফ হোসেন : অপ্রাপ্ত রচনা থেকে চয়ন • ২৮৩

পর্ব-২

মীর মশাররফ হোসেন এর রচনা : পাঠভেদ-পাঠ সম্পাদনা বিতর্ক
(উপস্থাপক: আশিস সেন) • ২৯০
মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর কৃতি: সেকালের চোখে • ২৯৫
(সংকলক: অনিরুদ্ধ মহাপাত্র)
সাহিত্যানুভূতি প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন • ৩১২
(সংকলক: শরিফুল চৌধুরী)

পর্ব-৩

মীর মশাররফ হোসেন: জীবনপঞ্জি ও বংশলতিকা • ৩২৫
মীর মশাররফ হোসেন: রচনাপঞ্জি • ৩২৯
মীর মশাররফ হোসেন বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি • ৩৩৩
বিবিধলিপি-তে উল্লেখিত মশাররফ কর্তৃক সংগৃহীত-পঠিত বই • ৩৩৬
মীর মশাররফ হোসেন: স্মৃতির কিছু আলোকচিত্র • ৩৩৯

প্রাবন্ধিক-পরিচিতি • ৩৪৭

মীর মশাররফ হোসেন : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

এ টি এম সাহাদাতুল্লা

মীর মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'জমীদার দর্পণ' প্রভৃতি একদা সাহিত্যানুরাগী সমাজকে আলোড়িত করেছিল। পূর্ববঙ্গে এই আলোড়নের ঐতিহ্য বহমান আছে অদ্যাবধি। উত্তর সাতচল্লিশ পর্বে নানা কারণে এপার বাংলায় মশাররফ সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার ধারা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে স্থান পাচ্ছেন মশাররফ। তবে এই পর্যন্ত। এপার বাংলায় মশাররফ চর্চা এখনও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নির্মিতি পায়নি। মশাররফ বিষয়ক আলোচনা, সমালোচনার বই এর খুবই অভাব এখানে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মীর মশাররফ হোসেন' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) ও সিরাজুদ্দীন আহমেদ এর 'মীর মশাররফ হোসেন' (সাহিত্য অকাদেমি) ব্যতীত এদেশ থেকে প্রকাশিত মশাররফ কেন্দ্রিক কোনো আলোচনার বই এর কথা আমাদের জানা নেই। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহও কলকাতায় সহজ প্রাপ্য নয়। এই অবস্থায় মশাররফ সম্পর্কে বিশেষত তাঁর ব্যক্তিত্ব বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া খুবই বিড়ম্বনার। এদিকে দায় ও দায়বদ্ধতা অস্বীকার করার না। তাই উদ্যোগী হতেই হল। তবে আনন্দের কথা, ওপার বাংলা থেকে মশাররফকে নিয়ে বেশ প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যাতে, বিশেষত আবুল আহসান চৌধুরীর কল্যাণে অনালোচিত আলোচ্য বিষয়ে নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি ড. আহসানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'মীর মশাররফ হোসেন অপ্রকাশিত ডায়েরি', যেখানে রয়েছে ব্যক্তি মশাররফের অন্তরঙ্গ প্রকাশ। আমরা এইসব সহায়ক সূত্রকে ব্যবহার করে কিছু কথা বলার চেষ্টা করতে চাইছি।

বনেদি জমিদার পরিবারের সন্তান মীর মশাররফ হোসেন। তবে জমিদারি হালের ঠাট তাঁর মধ্যে কখনো তেমন প্রকট ছিল না। আসলে পারিবারিক জমিদারির তখন চূড়ান্ত পড়তি অবস্থা। পারিবারিক বিবাদ, অপরিমিত বিলাস ব্যসন নানা কারণে এস্টেটের অবস্থা তলানিতে এসে পৌঁছেছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য মশাররফকে চাকরি নিতে হয়েছে অন্য জমিদারি এস্টেটে। চাকরি বজায় রাখার জন্য তোষামোদ করতে হয়েছে শোষণকারীর শীর্ষ অধিকর্তাকে। কিন্তু তাতেও অনেক সময় শেষরক্ষা হয়নি। জীবনের এই পর্বে বস্তুত জমিদারি তখৎ থেকে চ্যুত মশাররফ নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন সেদিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। এই অবস্থা না হওয়ার অন্তই হয়েছে। একদিকে হয়েছেন পলাতকি,

অন্যদিকে বাড়ছে বাবুয়ানা; দুই-এর দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে মশাররফের মানসলোক। এখানে আলো অন্ধকার, ভালো মন্দ সবই ভিড় করে এসেছে। ব্যক্তি মশাররফকে নিয়ে যেমন আমাদের গর্ব করার অনেক সুযোগ রয়েছে তেমনি অনেকক্ষেত্রে তিনি আমাদের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছেন। তবে তুলনামূলক বিচারে তাঁর মধ্যে আলোরই প্রাধান্য। নিজের চরিত্রচিত্র সম্পর্কে সত্য ভাষণের ক্ষেত্রে মশাররফ যে অকপট, দৃঢ় চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন তা সেদিনের পক্ষে বিস্ময়কর, আজকের দিনেও একান্ত দুর্লভ বিষয়।

ব্যক্তিজীবনের কথা, পরিবারের কথা বলতে গিয়ে আমরা সাধারণভাবে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করি, বলা এবং না বলা কথা নিয়ে লুকোচুরি খেলা খেলি। কেউ কেউ বা আরও একধাপ এগিয়ে মন্দ কথাগুলি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে কেবল ভালো ভালো কথা পুষ্ট করিয়ে তোলেন। মশাররফ এক্ষেত্রে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সত্য ভাষণের প্রেক্ষিতে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার জীবনী' ও 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম-জীবনী' বাংলা আত্মজীবনীর ধারায় অবিস্মরণীয় সংযোজন। নিজেকে গোপন করার সযত্ন প্রয়াস তো এখানে নেই-ই, উল্টো ইচ্ছা করে অনেক কিছুকে অনাবৃত করে দেখানো হয়েছে। যে কথা না বললেও লোকের ক্ষতি হত না তাও বলা হয়েছে বেশি বেশি করে। মশাররফের এই সত্যভাষণ ব্যক্তিচরিত্রের সীমা ছাড়িয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে পারিবারিক ক্ষেত্রে। পিতা মোয়াজ্জেম হোসেনের কথা বলতে গিয়ে মশাররফ সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। পিতার ব্যক্তি চরিত্রে নানা ত্রুটি ছিল। বাঈজীদের প্রতি আসক্তি এর মধ্যে অন্যতম। উক্ত ত্রুটির জন্য পুত্র কখনো পিতাকে ক্ষমা করেননি। মা দৌলতন্নেসার মৃত্যুর জন্য বাবাকে সরাসরি দায়ী করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যেসব চারিত্রিক দোষ ত্রুটি সম্পন্ন ছিলেন তার দায়ও অর্পণ করেছেন পিতার উপর। বলেছেন বাড়ির পরিবেশের জন্যই তাঁর এই অধঃপতন। ইন্দ্রিয় শিথিল পিতার কারণে বাড়ির পরিবেশে চারিত্রিক শৈথিল্য বাসা বেঁধেছিল। কৈশোর অতিক্রান্ত হতে না হতে মশাররফ শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বাড়ির জনৈক দাসীর সঙ্গে—'প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সত্য কথা বলিব। দাসী বান্দী কর্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্করেখায় কলঙ্কিত হয়।' (আমার জীবনী) অতঃপর তাঁর যৌনতৃষ্ণা ক্রমবর্ধিত হয়। দুর্ভাগ্য এই পিপাসা নিবৃত্তির কোনো অভাব হয়নি পারিবারিক পরিবেশে। ফলত স্বভাবেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য কলিকাতা বসবাসকালে জনৈক [illegible] গর্ভে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন মশাররফ। এ বিষয়ে তার স্বীকারোক্তি রয়েছে—'তাহার পর যাহা হতে এরূপ হইল—বেশ্যাসক্ত। তাহার কথা আমাদের উপর বেশী ঘৃণা—বহুদিনকাল মধ্যে তাহার গর্ভে আমার ঔরসে একটি পুত্র জন্মিল।' (কুলসুম-জীবনী) ইন্দ্রিয় শিথিলতার যে স্বভাব উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হয়েছিল তার অভিশাপ থেকে নিজেকে কোনো দিন মুক্ত করতে পারেননি তিনি। এমন কী বিবি কুলসুমের সঙ্গে মধুর দাম্পত্য সম্পর্কের কালেও। ব্যক্তিগত ডায়েরিতে বর্ণিত একটি অনুচ্ছেদ এখানে উল্লেখ্য :

> আর হঠাৎ এমন একটি মিথ্যা কথা জোরেজোরে বলিল যে—আমি তাহার কিছুই জানি না—এক যুবতী কি জানকী বলিয়াছে আমার কথা হইয়াছিল—সেই সকলই জানিয়াছে। আজ হঠাৎ বলে তুমি তাহার সেই কলিকা নিয়াছ। (ডায়েরি)

ঘটনার সত্যাসত্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সত্যভাষী মশাররফও যখন এমন অপকর্মের দায় স্বীকার করতে চাননি (আমি বলিলাম আমি মিথ্যাবাদী নহি, বিশ্বাসঘাতক নহি। আমি কাহারও সহিত কোনো কথা কহি নাই; কাহারও গায়ে হাত দেই নাই—ডায়েরি) তখন সন্দেহ থেকেই যায়। আবার এও সত্য, কেন কুলসুম এমনভাবে সন্দেহ করেন তাঁর স্বামীকে। এভাবে সন্দেহ করাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আমাদের বিশ্বাস কুলসুমের সন্দেহ অযৌক্তিক না। কেননা ব্যক্তি মশাররফ এর মধ্যে এমন সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল এবং উপযুক্ত পরিবেশে তার অঙ্কুরণ অস্বাভাবিক ছিল না।

অকপট সত্যভাষণ মশাররফ চরিত্রের আলোকিত অধ্যায় নিঃসন্দেহে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, যে কারণে তাঁর এই সত্যভাষণ তা আরও প্রশংসনীয়। অকপট স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে নিজের এবং অন্যের পিতার চরিত্র কালিমালিপ্ত করে কোনোরকম সহানুভূতি কুড়াতে চাননি মশাররফ। তাঁর ভুলে ভরা জীবনের সাপেক্ষে আগামী দিনের কোনো তরুণ যেন ভুল পথে চলা থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ পায়ে এই প্রত্যাশা থেকে অনুশোচনাদগ্ধ মশাররফ জীবনের উপান্ত বেলায় দাঁড়িয়ে পরম আকুতি ভরে কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন :

> আমার জীবনে শত শত ত্রুটি, শত শত 'অধোগতি' (দুর্গতি) এবং অচিন্তনীয় কার্য ঘটিয়াছে। তাহার কতক হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে একটি যুবক সাবধান হইয়া যদি সাবধানে সতর্কে জগতে চলিতে পারেন তবে হইলে আমার জীবন সার্থক ও সময় সার্থক মনে করিব। (আমার জীবনী)

কৃত ভুলের জন্য অনুশোচনার আগুনে পুড়েছিলেন মশাররফ, তবে নিজেকে তিনি বিশেষ অপরাধী বলে মনে করতেন না বলেই মনে হয়। কুকর্মের প্রেক্ষিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করান তিনি। বাড়ির পরিবেশের উপর দায় চাপিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপিত হয়েছে। এইক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ঈশ্বর বিশ্বাসের বিষয়টি। যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে বা হচ্ছে তার পেছনে ঈশ্বরের অমোঘ অভিপ্রায় আছে বলে বিশ্বাস করতেন মশাররফ। তিনি কৃত অপরাধের পেছনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছিলেন । সেইসূত্রে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকেই আশ্রয় করেছিলেন বিশেষ করে। ঘোর আস্তিকবাদী মশাররফ সর্ব অবস্থাতেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ কামনা করেছেন, ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করেছেন :

> কি করি ঈশ্বর তুমি সহায়—তুমি সর্বরক্ষক দয়াময় তুমি রক্ষাকর্তা। ভগবান তুমি রক্ষা কর তোমার সহায় ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। দয়াময় তুমি রক্ষাকর্তা—তুমি সর্ব বিপদের ভঞ্জন। (ডায়েরি)

এমন আস্তিকবাদীর পক্ষে জীবনের অনেক সমস্যাকে সহজে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং মশাররফের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দিক থেকে মশাররফ নিজেকে সদা পরিবর্তিত অথবা ক্রমবিবর্তমান এক সত্তা। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রধান শিক্ষক তাঁর জাতি ও ধর্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন—তিনি 'মনুষ্যজাতি' ভুক্ত এবং তাঁর ধর্ম 'মানবধর্ম'। এই মশাররফকেই আবার অন্য সময়ে বলতে শোনা যায় — 'আমার জন্মই আমাকে বলিয়া দিয়াছে একটি কুলায়, মোসলেম পিতার ঔরসে মোসলেম মাতার গর্ভে, মোসলেম আত্মীয় মোসলেম বর্গের ঘিরি মধ্যস্থলে আমার জন্ম হইয়াছে।' এখানেই শেষ নয়। তাঁর ধর্মবোধের মূল প্রোথিত হয়েছে আরও গভীরে। একদিকে মশাররফ যুক্তিবাদী, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসের জায়গা থেকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব। বানর থেকে মানুষের উদ্ভব এই তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে গেছেন :

> ভাই! তুমি যদি সত্য মুসলমান হও তবে আমার বিশ্বাসের সাক্ষী হইবে। কিন্তু পরীক্ষা করতে যাবেন করিবে। ডারউইন! আমরা নিশ্চয়ই জানি—আমাদের এ পবিত্র মহাত্মা বিদেশী পণ্ডিত কিছুই তোমার বানরের উদ্ভবের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। (আমার জীবনী)

নাস্তিক্যবোধ থেকে আস্তিক্যবাদের পথে এই যে যাত্রা তা একদিনে অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন ঘটনার অনুবর্তন আমরা হামেশাই লোকের মধ্যে দেখতে পাই। মশাররফও তাদেরই একজন। তবে তাঁর একটা নিজস্বতার দিকও রয়েছে। যে অর্থে আমরা কাউকে নাস্তিক বলি মশাররফ ঠিক তা নন। ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর মধ্যে সেই অর্থে কোনোদিনই কোনো অবিশ্বাস ছিল না। তিনি প্রচলিত ধর্ম সংস্কৃতির কয়েকটি দিক নিয়ে ঘোর সন্দেহ প্রবণ ছিলেন। ধর্মের নামে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল তাঁর চরম অপছন্দের বিষয়। সেদিনের বাংলাদেশ জুড়ে প্রচলিত হিন্দু মুসলমানের বিরোধের মূল উৎপাটন করতে তাঁর আন্তরিকতার শেষ ছিল না। 'গো-জীবন', 'টালা-অভিনয়' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আরও উল্লেখ্য বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষার প্রশ্নে তাঁর দ্বিধাহীন অবস্থান; প্রচলিত আরবি-ফারসি প্রভাবিত বাংলা ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতজ বাংলা ভাষার অনুসরণ, 'বিষাদ-সিন্ধু'-তে নামাজ, রোজা, মসজিদ প্রভৃতি সকল প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের অসংখ্য প্রতিশব্দ ব্যবহার; সমস্ত আরবি ফারসি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার না করতে পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ প্রভৃতি। এমন যে মশাররফ তিনিই আবার সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনে কলম চালিয়েছেন একটা সময়ে। 'রত্নবতী', 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রভৃতির জগৎ থেকে সরে এসে আবার নিমজ্জিত হয়েছেন 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হজরত বেলালের জীবনী', 'মদিনার গৌরব', 'মৌলুদ শরীফ' ইত্যাদির জগতে। এখানেই শেষ নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে হানিকর এমন সব উপাদানের বিস্তারিতও লক্ষ করা গেছিল তাঁর মধ্যে। জীবনের প্রথম পর্বে মশাররফ শুধু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধনের জন্য উদ্যোগী ছিলেন না, ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। পুজোর আসর, যাত্রা গান প্রভৃতিতে তাঁর সক্রিয় অবস্থান ছিল আনায়াসভাবে চোখে পড়ার মতো। এমন আত্মশক্তি যে ব্যক্তি তাঁরও রূপান্তর হল।

আর্থ-সামাজিক নানা কারণের অভিঘাত ছিলই, পাশাপাশি মশাররফের ব্যক্তি চরিত্রে স্খলন এমন সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল, এই কথাটিই আমরা বলতে চাইছি বিশেষ করে। মশাররফ বরাবরই নানা বিপরীত স্বভাবকে লালন করেছেন নিজের মধ্যে। যে কুলসুমকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার বলে জ্ঞান করেছেন শেষজীবনে সেই কুলসুম সম্পর্কেই বিরূপ উক্তিও দিয়েছেন, কোনোরকম সৌজন্যের, শিষ্টাচারের ধার ধারেননি :

> স্ত্রী জাতি এমন স্বার্থপর যে, যখন আমার চাকুরি ছিল—...কত আদর—কত ভালবাসা দেখান। কত নখরা চক্রা, ...কত রকমের যে মন ভুলান কথা, অধিক ঠার, ...কথা বাঁধা কত আহলাদের দেখান...। আর পাঁচটিন পর বাঁচী থাকিলাম। একটিবার জিজ্ঞাসা নাই যে তুমি কোথায় ছিলে...কাছে বসা নাই। না তেমন নিকটে বসা নাই। সেই এক ভাব—দূরের ভাব। আমার সঙ্গে কথা বলা নাই।...একখানি এক সঙ্গেই হটেল খাট—কিন্তু গোলাটি আর একসঙ্গে খাইতে চাহে না। বিবি সাহেব আর এক বিছানায় শুইতে ইচ্ছা করেন না। তবে না গল্প করে, মুখ বন্ধ করে, বিছানাতেই—ভাল—মন্দ নাই। বিছানা অন্য ঘরেই ঘরে। কত বাহার বিছানায় থাকিতে।
>
> (কুলসুম-জীবনী)

এমন আলোচনা প্রসঙ্গে, অশিষ্টাচারের আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। পাবনীর যে জমিদার ম্যানেজার একসময়ে মশাররফের আশ্রয়দাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, 'জমীদার দর্পণ' প্রভৃতি উৎসর্গ করে মুক্তকণ্ঠে যে ঋণ স্বীকারও করেছিলেন সেই মীর মহম্মদ আলীকেই পরে তিনি অপমানের একশেষ করেছেন। তার সম্পর্কে যা তা কথা বলেছেন। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কবিমোহনের ক্ষেত্রেও। দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার কবিমোহন খাঁন একদা মশাররফের পরম আশ্রয়দাতা ছিলেন। একদা কর্মচারীর অতিরিক্ত মাত্রার গুণ সম্মান দেওয়া হয়েছিল তাঁকে :

> জৌনপুরী কবিমোহনের সাহেব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিজ বাড়ে কুলসুম বিবিকে থাকিবার জন্য কলিকাতা হইতে আনেকপর পাঠাইলেন। এবং ১৪ জন দুর্গাদি চাকর করিতে ছিল, সকলকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রীর প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিবে না। আমাকে যেরূপ মান্য করিতে আদেশ প্রতিপালন করিতে সেরূপ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে।
>
> (কুলসুম-জীবনী)

প্রতিদান দিতে তিনিও কার্পণ্য করেননি। 'বিষাদ-সিন্ধু' উৎসর্গ করেছিলেন আশ্রয়দাতাকে। তারপর যখন সম্পর্কের তাল কাটতে শুরু হয় তখন বিপরীত পথ ধরে শেষপর্যন্ত হাঁটেন মশাররফ। উৎসর্গেই বিষাদ-সিন্ধু ফিরিয়ে নেওয়া হয় না, কবিমোহনকে ব্যক্তিগত আক্রমণও করা হয়। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'-তে এর সাক্ষ্য রয়েছে। তবে সাহেবজান হোসেন থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজনদের অনেকেই মশাররফ ও তাঁর পরিবারের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। মশাররফ নিজেও তা স্বীকার করেছেন। অথচ সাহেবজানেরই আত্মীয় পরিজন সম্পর্কে বিষোদগার করতে দেখা গেছে তাঁকে :

ভাই বীর বয়োজ্যেষ্ঠ তেজোল নিবাস হইতে আসিয়া আমাদের নিজ একেবারে ঘুচিয়া দিয়াছেন। আমি মনে ২ কখনই কলিকাতা আর যাইব না। কিন্তু পীড়াদের পূর্ব হইতেই কলিকাতা যাওয়ার ছিল। বিশেষ নিবাস হইতে আসিয়া কলিকাতা যাওয়ার আরও বেশী হইয়াছে। ভুবন উপর আলাপ করেন বটে — অন্তরে আন্তরিকে চক্ষের আড়ালে কিছুই নাই। আমার যেন একেবারে পর। পর হইতেও সময় অসময় দুই কথা জিজ্ঞাসা করি—ভাইসাহেব কখনই তাহা মনের করেন না। বড় লোক বড় তার উঁচু থাক—আমরা নীচ থাকি —হীন আশা— কি কথা। (ডায়েরি)

বেগম সাহেব বিবেচক, বিদ্যাবতী—পরের ভাল দেখিতে পারেন—আমার গুণ—সমুদয়ই দুঃখ অন্তরে জানেন কি। অহংকারে কথা। (ডায়েরি)

সাগোলাম এর সঙ্গে পারিবারিক বিরোধ ছিল। তাই 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-য় চরিত্রটির যে বিকৃত উপস্থাপন আছে তাতেও না হয় একটা ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু জনক সম্পর্কে বিরোধভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে মশাররফ নিজেকে একেবারে অনাবৃত করে ফেলেছেন:

এমন নিমকহারাম বিশ্বাসঘাতক স্বার্থ-সর্বস্ব লোক, জগতে যে সময় আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। জাল জালিয়াত ও হাতের আদা। কুটনীতি পরের মামলা, হাঁসের প্রতি অত্যাচার তার মাথার পাগড়ী। জমীদের আগে ধর্মিকের সাথে এমন কঠিন হৃদয়ের জন হয় উহা কখন কেহ দেখে নাই শুনে নাই। (আমার জীবনী)

আমরা অধিকাংশ জনই কাউকে না কাউকে ভালোবাসি। মশাররফও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রথম যৌবনেই তিনি বাঁধা পড়েছিলেন লতিফন নামের জনৈক সুন্দরীর প্রেমের বাঁধনে। পত্রবিনিময়, লুকিয়ে দেখা দেওয়া হয়েছিল পূর্ণমাত্রায়। প্রেমের অনলশিখায় উঠিয়ে হাবুডুবু খাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। এমন অনুপুর্ব প্রেম ব্যর্থ হয় বিধির বিধানে। কৌশল করে লতিফনকে বিয়ে দেওয়া হয় অন্য পাত্রের সঙ্গে। মশাররফের ঘাড়ে এসে চাপে তাঁর অপছন্দের পাত্রী আজিজননেসা। এমন অবস্থায় কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে প্রতিবাদী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মশাররফ প্রতিবাদ করেননি। পরিবর্তে বিয়ের আসরে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। চৈতন্য ফিরে পাওয়ার পরেও তাঁর মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। পরিস্থিতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। আর পাঁচজন বাঙালি পুরুষের মতোই অপছন্দের স্ত্রী নিয়ে তাঁকে ঘরসংসার করতে দেখি আমরা। একদিকে যেমন অপছন্দের স্ত্রী নিয়ে ঘর করেছেন অন্যদিকে তেমনি কারণে অকারণে তার সম্পর্কে কটূক্তি করে সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়েছেন মশাররফ—'বিবেচকের মন সম্পূর্ণরূপে খোলা। স্বামীর প্রতি ভক্তি ছিল না। স্বামী যে বাসনে আহার করিত সে বাসনে জল খাইতেন না।' (ডায়েরি)। প্রথম স্ত্রী সম্পর্কে এমন বিবেকই যেখানে শেষ কথা, সেখানে সম্পাদিত পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছে সেই স্ত্রীর-ই নামে। এরই বা কী ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে।

কুলসুমের সঙ্গে মশাররফের দাম্পত্য সম্পর্ক আদর্শ স্থানীয়। যখন বিয়ে হয় কুলসুম তখন নিতান্ত সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে। কোনো দিক থেকেই লেখক মশাররফের উপযুক্ত না।

এমন সাধারণ একটি মেয়েকেই নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছিলেন তিনি। কুসুম হয়ে উঠেছিলেন একজন লেখকের যোগ্য সহধর্মিণী। লেখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিতে কুসুমের আন্তরিকতা ছিল তুলনাহীন। অসমাপ্ত লেখা সমাপ্ত করার জন্য, নতুন লেখায় হাত দেওয়ার জন্য নিয়মিত তাগাদা দিতেন তিনি :

> ঐ জিনিষটা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলে শেষ করিলে না। এ জন্মের এক গল্প লিখিয়া ফেলিয়া রাখিলে কেন?***আর রাখিলে চলিবে না, পূজার পূর্বে চাই। কাহারও অনুরোধশী লিখিয়া আর দিলে না। (কুসুম-জীবনী)

কেবল তাগাদা দেওয়া না, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দিয়ে স্বামীকে লিখতে একরকম বাধ্য করতেন এই মহিয়সী :

> স্ত্রী এই সকল কথা শুনিয়াই কি কাজ থামিতেন? তাহা নহে। কথা বলিবারই অবসর দিতেন না তাহা নহে। কাগজ শেষ হলে এনিষ্টের তৈয়ার খাতা সমুখে ঘরের মেঝেতে পাতিয়া দিয়া তুলটি ধরিয়া স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিতেন। হাত না পাত্র নাড়িতেন না। বড় কাঁচা বিছানা ফেলিতেন না। (কুসুম-জীবনী)

সাধারণভাবে মনে হতে পারে কুসুমের এই যে আন্তরিকতা তা তাঁর ব্যক্তিগত অর্জিত শিক্ষা। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। মশাররফই তাঁকে এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। নতুন কিছু লেখা হলেই তিনি স্ত্রীকে তা পড়ে শোনাতেন, কুসুমও শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন :

> কুসুম যিনি যেদিন নূতন কোনো বিষয় কথা শুনিতেন, সেদিন আর শয়ন করিতে চাহিতেন না। বিষয় শুনিয়া —পরে শয়ন করিতেন।' (কুসুম-জীবনী)
>
> কিছুক্ষণ লিখা হইলে অসমাপ্ত রচনাটা আমাকে একা ডেকে শুনিয়া বলিতেন, "শুনি কই না হয় পড়ে শুনাও।" স্বামী এককথায় পড়িয়া শোনাইতেন। স্ত্রী অনুরাগে যেন বসিয়া শুনিতেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, "তার পর কি হলো শুনে যাও।" (কুসুম-জীবনী)

বিষয়টা এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমাজে বিশেষ প্রচলিত প্রথা নয়। সেদিনের প্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য প্রায়। মশাররফ এই অবিশ্বাস্যকেই দৃশ্যমান বাস্তবে মাটিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সমকালের অনেক পুরুষপুঙ্গবরা যা করে উঠতে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মশাররফ নিজের হাত থেকে কুসুমকে শুধু লেখাপড়াই শেখাননি, স্ত্রী যাতে নিয়মিত ডায়েরি লেখে সে বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণাতেই কুসুম ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। এই ডায়েরির অংশবিশেষ সম্প্রতি শামসুজ্জামান খানের তৎপরতায় আমাদের নাগালের মধ্যে এসেছে। ডায়েরি লেখার পাশাপাশি পড়াশুনা সম্পর্কে ক্রমশ বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন বিবি কুসুম। তাঁর পড়াশুনার সীমা প্রসারিত হয়েছিল মহাভারতের গভীর পাঠেও—'কুসুম সর্বদা মহাভারত পড়িতেন। মহাভারতের অনেক আখ্যায়িকা তাঁহার মনে ছিল।' (কুসুম-জীবনী) সংসারের চাপে সব সময়ে ঠিকমতো পড়া হয়ে উঠতো না। তাই সময়ে সময়ে স্বামীকে মহাভারত পাঠ করে শোনাতে আবদার করতেন কুসুম বিবি :

অন্ধকারে পার কুলসুম বিবি অতি-আগ্রহে খাইলেন। মীর সাহেব আর আমাকে একটুও অবহেলায় পড়িয়ে যাননি। খাইয়া না খাইলে তুমি আহার করিবে না। আমার অনুরোধ তোমার নির্ধারিত নিয়ম আর খাইয়া পরে অন্য কিছু না লিখিয়া আমাকে মহাপ্রভু পড়িতে হবেন। (কুলসুম-জীবনী)

মশাররফ কুলসুমের লেখাপড়ার বিষয়ে যেমন উৎসাহী ছিলেন তেমনি বিশেষ সচেতন ছিলেন নিজের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে। যেমন তেমন ভাবে না, ইংরেজিতে দক্ষতা সহ অন্যান্য বিষয়ে রীতিমতো শিক্ষিত হয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠুক তাঁর ছেলে মেয়েরা এমনই স্বপ্ন দেখতেন মশাররফ—'আমার কন্যাকে আমি খাটিয়া নিয়মমত পড়িয়ে নিতাম।' (কুলসুম-জীবনী) ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার সাধ ছিল। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। তাই কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করা সম্ভব হয়নি। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার বিশেষ সুবিধা করে দেওয়াও হয়ে ওঠেনি। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হওয়াই সার হয়েছে — 'অর্থাভাবে ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষার কোন সুযোগ করিতে পারিলাম না।' (ডায়েরি) সে যাই হোক, স্বার্থের অনলে দগ্ধ, আন্তরিকতা এবং কখনো পুরোপুরি ভস্ম হয় না। মশাররফের প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতাই এখানে শেষ কথা।

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনকে মধুময় করার জন্য একজন ব্যক্তিপুরুষের যা যা করণীয় তার সবই প্রায় করেছিলেন মশাররফ। স্বামী হিসাবে স্ত্রীকে যে সম্মান দেওয়ার দায় কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মশাররফ ছিলেন দ্বিধাহীন। একটি প্রসঙ্গের উল্লেখেই বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যাবে। একদা নৌকা যোগে স্থানান্তরে যাওয়া হচ্ছিল। কুলসুমকে দুপুরের খাবার খাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি। এতে রাগে ফেটে পড়েছিলেন কুলসুম। মশাররফ এক্ষেত্রে নিজে উদ্যোগী হয়ে সমস্ত ন্যায় অন্যায়ের দায় ঘাড়ে নিয়ে তাঁকে শান্ত করেছিলেন :

বিশেষ অনুরোধ করিয়া আমি নিজে ভাতের থালা বাড়িয়া মুখে সন্দেশ উঠাইয়া দিয়া কুলসুম বিবিকে খাইতে দিলে তিনি খাইতে লাগিলেন। খাইবেন না খাইবেন না বলিয়া যে রাগটুকু ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি অনুরোধ করিয়া বিশেষ মুখে তুলিয়া দিতেই সে প্রেমানল চন্দনের লেপন আগে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। (কুলসুম-জীবনী)

স্ত্রীকে এইভাবে সম্মান দেওয়া, তাকে সম্মানিত করার বিষয়টি বাঙালি সমাজ এখনও তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মশাররফ এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের আদর্শ স্থানীয়।

মশাররফের ঔরসে জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা চৌদ্দটি। [illegible] এক, আজিজননেছার গর্ভজাত দুই, কুলসুমের গর্ভে জাত এগারো। সাংসারিক বা অন্য কোনো কারণে কোনো সন্তানই পিতার স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রত্যেককে সাধ্যমতো আদরে ভালোবাসায় সিক্ত করেছিলেন পিতা মশাররফ :

ছেলেদের সব আবদার আমার নিকট। মায় অন্যান্য আবদারও ছেলেরা করিয়া কথা বলিতে কোনমতেই ভয় করিত না। কিন্তু আমাদের মায়ের নিকট খাইতে দেখাব করিতে সাহসী হইত না। (কুলসুম-জীবনী)

স্ত্রীর পুত্রটি সম্পর্কেও তিনি উদাসীন ছিলেন না; যৌথভাবেই থাকতেন। পুত্র শিহাব পরিচয়ে ছোটো থেকে মানুষ হয়েছিল। তবে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিতেই হয়তো আত্মজীবনীতে বিষয়টি সাড়ম্বরে উল্লেখিত হয়ে থাকবে—'ছেলেটা স্কুল পড়িতেছে। তাহার পর একবার খবর পাই যে, তাহার বিবাহ হইতেছে। বিবাহ সমস্ত নিষ্পন্ন করিতে হয় আমারই। পুত্র পড়িয়া দিয়া বিবাহ হইয়াছে।' (কুলসুম-জীবনী) পুত্র কন্যাদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা ও বাৎসল্যের নিদর্শন হিসাবে একটি প্রসঙ্গের অবতারণাই যথেষ্ট। প্রথম কন্যা চমনআরার জন্মমুহূর্তে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন সম্পাদক। সেদিনের সে আদুরে ছবির উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন :

> কন্যা জন্মিলে উহাকে নজরে দিলাম। চতুর্দিক চমক বাজনা করিলাম। ধাত্রীরা ইত্যাদি সাড়ম্বরে মহা দিলাম। সেই দিন হইতে আমি কন্যা জন্মিবার পরদিন চাঁদের মত শান্তির বাতাস বহিল। আমার অবশ মন হইতে পূর্ব দিনের পূর্ব যেন সমুদ্রে যেন ডুবিয়া গেল। (কুলসুম-জীবনী)

এ ছাড়া জীবনের আলোকিত অধ্যায়ের চিত্র। এর উল্টো চিত্রও রয়েছে। নিদারুণ অর্থকষ্টের দিনে অসুস্থ সন্তানের জন্য কেনার পরিচিত অবগাহন করেছেন, হৃদয়ের প্রতিটি বাঁধ ভেঙেছেন অসহায় পিতৃত্ব। প্রকাশ হয়েছে আবেগিক পৃষ্ঠা :

> দুঃখের সহিত লিখিতেছি—শ্রীমতী আফেজা খাতুন এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার অসুস্থ থাকায় না হইয়া হঠাৎ একদিন রাত্রি অজ্ঞান হইয়া পড়ে—সেইদিন রাত্রি ১টার সময় ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সালের অনন্ত নিদ্রায় রাত্রি ২৬ শে রজব তারিখে প্রাণলীলা সম্বরণ করে। আমি কলিকাতায় ছিলাম মৃত্যুসময়ে আমার সহিত দেখা হয় নাই। আমার দুরবস্থার দরুন উহাদের পীড়ায় ঔষধপত্র চিকিৎসা—যেমনতেমন হয় নাই। মনে পড়িলেই আক্ষেপ রহিয়া গেল। মৃত্যুর পূর্বে পীড়ায় (আমাকে) দেখার জন্য পাগল হইয়াছিল। আর তাহার আমার নিকট ... ছিল পীড়াকে দেখিব। তাহাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় নাই। একেবারে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। দুঃখের সীমা কতদূর জানি না।

সুস্থভাবে বাঁচার জন্য চাই উপযুক্ত অর্থ। চাকরি করে বা অন্য কোনোভাবে এই অর্থ সংগ্রহে সম্পাদক ছিলেন ক্লান্তিহীন। চাকুরির নিশ্চয়তা ছিল না। নানাকারণে বিভিন্ন সময়ে চাকুরি খোয়াতে হয়েছে। চাকুরিহীন সম্পাদক নিয়োজিত হয়েছেন পত্রিকা সম্পাদনা, প্রেস পরিচালনা সহ বিভিন্ন কাজে। জীবনের শেষপর্বে কলিকাতা ইসলামী আখবার রচনা করার মূলেও ছিল এই আয় রোজগারের বিষয়টি। এত করেও সংসারের শেষ রক্ষা হত না। কখনো কখনো কপর্দক শূন্য প্রায় হয়ে পড়তেন তিনি। দিনলিপির পাতায় উঠে এসেছে সে নিঃস্ব অসহায়ত্বের কথা :

> কত দুঃখে কষ্টে ছেলেদের লেখাপড়া করিতেছি কিছুতেই তাহার ব্যয় করিতে পারিলাম না। দৈনিক আহার—সরকারমহাশয়দের সাহায্যে পাইতেছি—আর নির্ভর করবার কোন উপায় নাই। কি করিয়া জীবিকা নির্বাহ হইবে তাহার কোন উপায় নাই সত্য

নাই—প্রতিবাসগণের পরিবারের মধ্যে নাই। মেয়েদের নিকট কিসে—সত্য মেরা কাপড়, মণি—দান করিবার জন্য কাহার নিকট পাত্রের আদেশ নাই। কাজীর একালেশ। (আমার জীবনী)

সম্পাদক বা লেখক মশাররফ হোসেনের জীবিকার বিষয়ে কতটা নির্ভরশীল ছিলেন তা আমাদের সকলেরই জানা। এক্ষেত্রে বিশেষ করে উল্লেখ করার প্রবৃত্তিটি মশাররফের কর্মক্ষেত্রে ক্রিয়াশীলতার দিকটি। আমরা আগেই বলেছি কোনো চাকুরিতে তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। যতদূর জানা যায় এই না পারার পিছনে আর যে কারণই থাকুক কর্মদক্ষতার অভাব ছিল না। জীবনের শেষপর্বে তিনি নতুন করে বহাল হয়েছিলেন পদমদী এস্টেটের ম্যানেজার হিসাবে। এস্টেটের তখন চরম দুরবস্থা। জমিদারি নিলামে উঠার উপক্রম। মশাররফের অক্লান্ত পরিশ্রম আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সে যাত্রায় রক্ষা পায় পদমদী স্টেট। এস্টেটের উন্নতির জন্য এইসময় মশাররফকে যে কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল তার পরিচয় আছে কুলসুম-জীবনীতে :

> পদমদী আসিয়া দুইবার পর বাড়ী দশ দিয়াছি, বেশী কারবার নাই। কিন্তু আমার কার্য সুসার না। তাহাতেই প্রায় ৫ কুলসুম বিবি বলিতেন। যে ইচ্ছা সংসার খরচ স্টেটে তোমার কারবার করিতে দেখিতেছি। এত খাটিতে ত দেখি নাই। আমি বলিলাম—এই বড় স্টেট সব হারাল উহা সংসার রহিবে না সকলেই বলে। আর আমার স্টেটে থাকিতে না দিলে থাকিবে। এই দুইটা দল আমি আদায় করিতে চেষ্টা করিতেছি। (কুলসুম-জীবনী)

প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা শখের বা ভালোবাসার বিষয় থাকে। মশাররফেরও তা ছিল। গান বাজনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অত্যধিক—'গান বাজনা শুনিতে আমার স্বভাবতঃই বাসনা। গান বাজনার আওয়াজ শুনিলেই মন নাচিয়া উঠে। সে স্থানে উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।' ফারসি কবি বলেছিলেন প্রিয়ার মুখের ছোট তিলটির জন্য তিনি সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে পারেন। মশাররফ ঠিক তেমনভাবে কিছু বলেননি, তবে তাঁর বেশ কিছু উচ্চারণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় আমোদ প্রমোদের জন্য জাগতিক অনেক ন্যায় নীতিকে দু পায়ে মাড়িয়ে চলতে দ্বিধা হয় না :

> এমন অপূর্ণ তৃপ্তির জন্য অন্তরের লোকের কাল অতৃপ্ত আমোদের স্থানে থাকা কখনও সঙ্গত নহে। আমার ছিদ্রানুসন্ধান থাকা উচিত নহে। সকলই বুঝি, অথচ উপস্থিত সময় কিছুই মনে থাকে না। সে সময়ে ভাল মন্দ জ্ঞান থাকা থাকে না। (আমার জীবনী)

এই যে প্রবল আমোদ-প্রমোদপ্রিয়তা তার নেপথ্যেও রয়েছেন পিতা মোয়াজ্জম হোসেন। লতিফা সুন্দরীকে নিজের কাছে বেঁধে রেখেছিলেন তিনি। এই সুন্দরীই শেষপর্যন্ত দৌলতুন্নেসার মৃত্যুর কারণ হয়। মায়ের মৃত্যুর জন্য পিতা বা তাঁর প্রতিপত্তিকে কখনও ক্ষমা করতে পারেননি মশাররফ, এ আমরা আগেই বলেছি। অথচ আবার সংসারের যে মূল কারণ অপরিমিত আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীতপ্রিয়তা প্রভৃতি তার থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি তিনি। জমিদারি হল এর মূল কারণ। এই রকম যোগ প্রবাহে বা অসামঞ্জস্য মধুখাতার মধ্যে

বয়ে যায় বহুদূর পর্যন্ত। ভাসিয়ে নিয়ে যায় চারপাশের সমস্ত কিছুকে। প্রকৃতিপ্রীতির পাশাপাশি মশাররফের আরেক এক প্রিয় বিষয় ছিল ভ্রমণ। আজকের মতো সেদিন স্থলপথে ভ্রমণ সুবিধাজনক ছিল না। তাই জলপথে ভ্রমণ ছিল মশাররফের সবচেয়ে আকর্ষণ। সুযোগ মতো নদীপথে নৌকাযোগে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে দেখি তাঁকে :

> এ কারণে দিন পদ্মার মধ্যে রহিলাম, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগাইতো কুলসুম বিবিকে সঙ্গে করিয়া পদ্মার তীরে উঠিতাম, রাত দুই ঘণ্টা সময় পদ্মার চরের উপর হাঁটিয়া বেড়াইতাম। দুইজনে সে সময়ে কত কথাই কহিতাম। (কুলসুম-জীবনী)

জমিদারী অবকাশে অবসরকালে প্রাণ প্রিয় স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে মাঠে পরিভ্রমণ করতেন, সিনেমা থিয়েটার দেখে সময় কাটাতেন মশাররফ।

মশাররফের ব্যক্তিগত ধর্মবোধ নিয়ে আমরা কিছু কথা বলেছি এবং আরও কিছু কথা বলার অবকাশ আছে। ইসলাম ধর্মের বিধি বিধানের প্রতি মশাররফ যথেষ্ট অনুগত ছিলেন না একথা তাঁর সমালোচকেরা বারবার বলেছেন। নিয়মিতভাবে নামাজ না পড়া, রোজা না করা, হিন্দুদের সমর্থন করে গোরু কাণ্ড, আল্লাহ শব্দের স্থলে ঈশ্বর শব্দের পুনঃপুনঃ ব্যবহার এসবের কারণে তাঁকে কাফের বলে ফতোয়া দেওয়াও হয়েছিল সেদিন। এমন সব ফতোয়ার প্রেক্ষিতে আমরা মশাররফকে আমাদের মতো করে আর একবার যাচাই করে দেখতে পারি। ইসলাম ধর্মানুসারে কাফের হল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতায় বিশ্বাসী না এবং যে নবী মহম্মদ (সা) এর নবুয়ত স্বীকার করেন না। তাই যদি হয় তবে মশাররফকে কাফের বলা চলে না কিছুতেই। তিনি যে শুধু ঈশ্বরের অপার মহিমাতেই বিশ্বাসী ছিলেন না, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে বিশ্বাসের গভীর প্রদেশে। নির্জীব বিশ্বাস বোধ থেকে একজন মানুষ যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তখন তা বিশ্বাসমাত্রের সীমাতেই আবদ্ধ থাকে, সত্যের অমোঘ উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয় না। মশাররফের ঈশ্বর বিশ্বাসের মধ্যে সহজ সজীবতা ছিল। তিনি শোকে, দুঃখে কাতর হয়ে একদিকে যেমন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছেন অন্যদিকে তেমনি এই দুঃখ কষ্টের জন্য ঈশ্বরের প্রতি অনুযোগ করতেও দ্বিধা করেননি :

> সবাদরের নাম সাজেদা। তবে আমার বাটীতে একণ কর্ত্রী সেই বেগম নিজে আবদ্ধ—লোকজন নাই। প্রতিবেশক অবধা আবদুর-আবালিদের এর সাহায্যপ্রার্থী প্রতিপালক কেহ নিজেন। জানি না ইহার মধ্যে খোদার কি আদেশ ও অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে। তাহা তিনিই জানেন—সকলই সেই দয়াময় ভগবানের ইচ্ছা। (আত্মজীবনী)

কোনো সন্দেহ নেই, মশাররফের আত্মবিশ্বাস সীমাহীন, অতলান্ত এবং গভীরতর। আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারিনি এই যা সমস্যার কথা।

ইসলাম ধর্মদর্শনের প্রতি মশাররফের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন, পূর্ণ আনুগত্য। ইসলামের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক দিক, বিশেষত বাঙালি মুসলমানের যাপিত জীবনে যে কুসংস্কারের ছড়া ছিল তার কোনো দিক সম্পর্কে ছিল মশাররফের ঘোর আপত্তি। বাংলাদেশে অবস্থান

জন্মে, বাংলাদেশের জল হাওয়ায় বড় হয়ে সেই বাংলা ভাষাকে আপন করে নেবে না এ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন :

> আমরা মুসলমানকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়াছি, আমরা বাঙালী, বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা, আমরা কি আমাদের অবমাননা করিয়াছি। কোন দেশে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া স্বদেশীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া সেদেশীয় ভাষা ব্যবহার করা অসম্মানজনক কিছু নহে; পরন্তু ইংরেজের দেশটি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিঃস্বীকৃত ভাষা ব্যবহার করা উপহাস-জনক। ইহাতে অন্ধ দর্শনের কিছু নহে, বরং মাতৃভূমির প্রতি ঘৃণা করিয়া পশ্চিমদেশীয়বাসী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে গৌরব বিবেচনা করি।... যাহা হউক, আমরা বাঙালী বলাতে আমাদের অবমাননা হয় নাই...। (এ দেশের মুসলমানেরাও বাঙালী, আজীজন নেহার)

ইসলামের যে দার্শনিক প্রতীতি তার স্পর্শ মাত্র ছিল না সেদিনের মুসলমান-মনে। শুধু কতকগুলি আনুষ্ঠানিক দিক মাত্রকে আঁকড়ে ধরে পথ হাঁটার চেষ্টা করেছিল গোটা সমাজ। আরবি ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান কারও ছিল না, সবাই শুধু মুখস্থ বুলি হিসাবে তোতার মতো আউড়ে যেত। এমন কী কোরানের হাফেজ যারা হতেন তারাও এর এক বিন্দু অর্থগ্রহণে সক্ষম ছিলেন না। এদিকে সমাজ এইসব হাফেজদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন চূড়ান্ত সম্মানের আসনে। অথচ অর্থবোধহীন কোরান পাঠ ইসলামের বিধান। ধর্মীয়দের এই সীমাবদ্ধতাকে মশাররফ তাঁর আক্রমণের নিশানা করেন :

> পুণ্য জন্য আরবী শিক্ষা। কোরান শরীফ পাঠ। সে পাঠ বড়ই আশ্চর্য। অক্ষর পরিচয় হইলেই কোরান শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবী কোরান শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না। এখন পর্যন্ত যেখানে যাহারা কোরান শরীফ পড়িয়া পরম উপার্জন করে, তাহারা ত জানেই না। ...যে কোরান শরীফ অর্থশূন্যভাবে আবৃত্তি করিতে পারিলে তাহার নাম গ্রাম দূর অমুক পরগণায় পরগণায় জারি হইল—অমুক গ্রামে অমুক হাফেজ হইয়াছেন। (আমার জীবনী)

কেবল আলোচ্য প্রসঙ্গে নয়। সমাজের অন্যান্য অনেক অসংগতির দিক নির্দেশ করে প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়েছেন মশাররফ। উত্তর পলাশির যুগ পর্বে নানা কারণে মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থা লড়াই করার জন্য, নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দরকার ছিল উপযুক্ত সংযম। কিন্তু সমাজ সে সংযম দেখাতে পারেনি। বরং ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেলেও বাইরের বাবুয়ানা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল প্রাণপণে। এ সবের প্রতিবাদ করা হয়েছে বিশেষ করে :

> মুসলমান সমাজের প্রায় অর্ধেক আছে এইরূপ বাবুয়ানা বাবুগিরি বড় আদুরীর অথচ সংসারের শত পরিচ্ছেদ, বড় বড় কথা।...কাহারও বা মসজিদ ঘরে ঠেকিস এক টাকা। দুধ, চা, বিস্কুট রুটি মাখন যোগাইতে কত কষ্ট হয় তাহার খবর জাল, চাল, লবণ, তৈল বলিয়া কাহিরা পড়িয়াছে পরিবারের বেশ ভূষণে শোভা পুরিয়া উঠিতে পারে। তাহা না করিয়া মাতার টাকার শ্রাদ্ধ। দুবেলা ভাল ভাত না হয় আল্লাহর—হাতে উপবাস। (আমার জীবনী)

প্রসূতি সম্পর্কে মুসলমান সমাজের প্রচলিত সংস্কার ও বিধি নিষেধ প্রচলিত রয়েছে, তার কোনো যৌক্তিকতা নেই, নেই শাস্ত্রীয় ভিত্তি। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মশাররফ তুলোধুনো করেছেন তাঁর সমাজকে :

> প্রসূতিকে কেহ স্পর্শ করে না। শরীরে রক্ত কাপড়ে, না স্থান স্নান স্থানে। প্রসব করিয়া কি অপরাধেতেই যে স্পর্শ করে, তাহা কেহই মুখ ফুটিয়া বলে না। এমন পবিত্র আত্মীয় অনুরোধ মধ্যেই গণ্য নহে। গরু হইতে নীচ, গাভীর গোবর কুকুর হইতেও ঘৃণিত পাত্র।—হায়! সমাজ এ প্রথা কোথায় শিক্ষা করিয়াছে? এমনতর স্বর্গের কোন পুস্তকে এরূপ নির্বিবেক পদ্ধতি নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা উপদেশ আদেশ রহিয়াছে এ সকল শিক্ষা করিয়াছে কোথায়? যে যবীয় সমাজ মুসলমান ভাইসকল। এ শিক্ষার প্রকার কাহারা? (আমার জীবনী)

শিক্ষালাভ ও জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। এদিকে বাস্তবে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে যেন মুসলমান সমাজের বৈরিতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যারা পড়ে ছেলেরা কমবেশি লেখাপড়া শিখতে শুরু করলেও মেয়েদের শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সমাজমানস এখনও বদ্ধপরিকর। এর প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন মশাররফ। 'হিতকরী'-র সম্পাদকীয় কলমে মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন তিনি :

> মুসলমান রমণী মধ্যে বিদ্যার্থী ও শিক্ষার সুপ্রশস্ত পথ নাই, জ্ঞানলাভের কোন উপায় নাই, ভাল-মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই, সত্যাসত্যের বিচার করিবার বুদ্ধি নাই, নিজের দুর্দিনের সময়েও সদুপায় দ্বারা পরিমিত সুখ অর্জন করিবার সাধ্য নাই। (গাজী মিয়াঁর বস্তানী)

তবে শুধু স্বসমাজের সমালোচনা নয়, মুসলমান সমাজের এই দুরবস্থার জন্য প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকেও বিশেষভাবে দায়ী করা হয়েছে। আজকের পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে বাংলার হিন্দু সমাজ তাদের শত শত বছরের মুসলমান প্রতিবেশীকে যেন আর চিনতেই পারেন না। তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করা তো দূরের কথা, তাদের মানুষ পদবাচ্য বলে মনে করেন না। কোনো মুসলমানের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা, সভ্যতা ভব্যতার নিদর্শন দেখা যেতে পারে এ তাদের ধারণার অতীত। একজন ভদ্র মুসলমান পুরুষের সাক্ষাৎ পেলে তারা মনে করেন এ লোকটি পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই হিন্দু ছিল, কর্মদোষে মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছে, এমনই মনোভাব তাদের শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বিদ্ধ করা হয়েছে এই মানসিকতাকে :

> এই লোক কি মুসলমানের উপযুক্ত? না মুসলমান কি পাপে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিতে পারি না। নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে হিন্দু ছিলেন। কোনরূপ পাপে নীচ ঘরে, ম্লেচ্ছ ঘরে জন্মিয়াছেন।' (আমার জীবনী)।

উক্ত প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের এই মানসিকতার প্রেক্ষিতে স্বসমাজের দুরবস্থার কথা ভেবে বিচলিত হয়েছেন মশাররফ। তখনও পর্যন্ত সমাজের উন্নতিতে বড় ভূমিকা নিতেন জমিদার শ্রেণি। মুসলমান জমিদারদের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ লক্ষ না করে বিষোদ্গার করেছেন তিনি :

অভিজাতশ্রেণীর মুসলমান সাহেবগণের দৃষ্টি এদিকে তত নাই। তবে যে দুই একজনের নাম দেখা যায়, সে কেবল নাম কিনিতে। বাস্তবে গভীর স্থান হইতে কোন অভিজাত শ্রেণী, সামাজিক উন্নতি, ধর্মের উন্নতি, কখনও মুসলমানের উন্নতিকল্পে আজ পর্যন্ত যোগদান করেন নাই। তাঁহাদের যোগদান করার অভাবের বিপরীত। (হিতকরী, ২০ শ্রাবণ ১২৯৮)

অভিজাতশ্রেণীর এমন লোকজন, ধর্মের জন্য দান করে না। কেবল নাম কিনবার জন্য দান।...উচ্চ অন্তরে কত ভদ্রবংশের ছেলে কত প্রকার নীচ বাসনা অবলম্বন করেছে। কত পতিতা, হা অন্ন, হা অন্ন করে, ঘরে পড়ে মরছে।...সেদিকে লক্ষ্য নাই।...কেবল নাম কুড়াবার জন্য দান। (গাজী মিয়াঁর বস্তানী)

মুসলমান সমাজের মধ্যে যারা সমাজের সুখ দুঃখের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে, সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্যোগ না নিয়ে নিরাপদে পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিজেদের মতো করে বাঁচার চেষ্টা করেছেন তাদের প্রতি খুবই আক্রমণাত্মক হয়েছেন মশাররফ :

যারা লেখাপড়া শিখে, কিছি সাহেবোর মতো অহংকারে মেতে, হিন্দুজাতির সঙ্গে মিশ দিয়ে বেড়াচ্ছে, মুখে সাহেব কিচিমিচি ভেঙে গুঁটি বোঁজ করে থাকে, তারা কি মানুষ। (উদাসীন পথিক)

ধর্মবোধ এবং মনুষ্যত্বের মধ্যে যে একটা সাধারণ সেতুবন্ধন থাকে সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল উত্তর পলাশি যুগপর্বের বাংলাদেশে। এই সেতুটাকেই মেরামত করার জন্য বিশেষ যত্নশীল হয়েছিলেন মশাররফ। ধর্ম নিরপেক্ষতাবশে কোনো সত্যকে আর প্রতিষ্ঠা দেওয়া মোটেই সহজ হবে না এ তিনি বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন। তাই সবসময় ধর্মপরিচয়কে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে চেয়েছেন—'ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ ইহকাল পরকালের সার ধর্ম। ধর্মের সহিত জীবনের সম্বন্ধ না থাকিলে সে জীবন বৃথা।' বলাবাহুল্য এ ধর্মের নাম মনুষ্য ধর্ম; হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি তার পোশাকি নাম মাত্র। মনুষ্যধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন বলে দুই বিপরীতের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে; একাধারে 'গো-জীবন' ও 'মদিনার গৌরব' রচনা করতে কোনো সমস্যা হয়নি মশাররফের পক্ষে।

জীবনে চলার পথে ছিল হাজারও প্রতিবন্ধকতা। এতসব প্রতিবন্ধকতার বেড়া ডিঙাতে ডিঙাতে পরিশ্রমের একশেষ হতো। সময়ের কাজ সময়ে করা হয়ে উঠতো না। বিরক্ত হতেন মশাররফ। ধিক্কার দিতেন নিজেকে :

অদ্য একটী বিষয় স্থির নিশ্চয় করিয়া প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইতেছি। অদ্য হইতে দৈনিক বিবরণ নিয়ম মত লিখিব। সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত লিখিব। যেদিন সুবিধা হয়—সেইদিন জীবনবৃত্তান্ত লিখিব। কিন্তু দৈনিক বিবরণ অদ্য হইতে প্রতিদিন না লিখিয়া নিদ্রা যাইব না। মানুষে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে না এ কি কথা—কিছুই বুঝি না। (ডায়েরি)

এ ধিক্কার ধ্বনির সুরে, ছন্দে একাধারে পুলকিত ও বিস্মিত হই আমরা। এমন করে যাঁরা নিজেকে ধিক্কার করতে পারেন বিধাতা সাফল্যের ঝুলি বুঝি তাঁদের প্রতিই উপুড় করে দেন। ছোটো বড়ো মিলিয়ে মশাররফের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশ বা তারও বেশি। এর

মধ্যে কয়েকটি জন্য অনায়াসেই বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। একদিকে জীবিকার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম, অন্যদিকে বিরাট লেখার সম্ভার। ঠিক যেন মেলানো যায় না। প্রতিভার অসামান্যতা ও সাধনার একাগ্রতার যৌথ ফসল এসব। নিজস্ব লেখালিখির বিষয়ে মশাররফ কতটা একাগ্র ও আপোসহীন ছিলেন তার আরও কিছু দৃষ্টান্ত চয়ন করা যাক ডায়েরির পাতা থেকে :

> আমি লিখিতেছি রাত ১২টা অতিক্রম হইয়াছে। আর আমার ঘড়ি নাই।...দেওয়ানী আদালতের ঘড়ি, ফৌজদারী আদালতের ঘড়ির আওয়াজ শুনা যায়—এখনও সবে লিখিতেছি। আর আমার সেই লাটের চেয়ার—অর্থাৎ তাহার কাহিনী চেয়ারে—আজ টেবিলে বসিয়া কিছু প্রবীণ আলাইয়া লিখিতেছি। (ডায়েরী)

কুলসুমের দিনলিপিতে রয়েছে আরও উজ্জ্বল সাক্ষ্য :

> আমি ও শুইলাম। তিনি অনেক রাত পর্যন্ত লিখাপড়া করিলেন। যখনই চক্ষু খুলিয়াছে তখনই দেখিয়াছি তিনি বসিয়া আছেন দুইটি বাতি জ্বালাইয়াছেন—আরও জল দিয়া বাতি জ্বালাইয়াছেন আরও খুব আলো ভাল হইয়াছে। (১৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৮, বুধবার)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে বাংলার জমিদার সমাজ যে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছেছিল তারপরে তাদের পক্ষে আর ইংরেজ জাতি ও সরকারের বিরোধিতা করা স্বাভাবিক ছিল না। মশাররফের পরিবারও তার ব্যতিক্রম না। ব্যক্তিগতভাবে মোশাররফ হোসেন ছিলেন ইংরেজের অনুগত, নীলকর কেনীর সঙ্গে ছিল তার গভীর সখ্যতা। অবশ্য নীলকরের শত্রুপক্ষকে শত্রু হিসাবে জ্ঞান করতেন না তিনি। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-য় দেখা যায় টি আই কেনীর পরম শত্রু প্যারীসুন্দরীর প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। প্যারীর বীরত্বে মুগ্ধ, প্যারীর বিপদে রীতিমতো কাতর হতেন তিনি। পরিচিত মুখের আড়ালে মোশাররফ হোসেনের এই যে আর একটা মুখ ছিল সেটাই উক্তিসমূহের মধ্যে, বিশেষত মীর মশাররফ হোসেনে আরও স্পষ্ট হয়েছে। স্বদেশীয়, দীন দুঃখী মানুষের প্রতি অনুরাগের প্রশ্নে মশাররফ ছিলেন আপোসহীন। জীবন জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে অসহায় প্রজার জন্য সাধ্যমত সাহায্য করেছেন তিনি। 'সময়' পত্রিকায় 'প্রতিবাসী শ্রী মশা' ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর একটি পত্রের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে :

> প্রজা টাকা দিতে অপারগ হইলে, ঐ প্রজার পাঁচ টাকা সুদের জন্য আটকাইয়াছেন। কি আশ্চর্য! ইংরাজরাজ্যে এখনও এরূপ অত্যাচার!...আমাদের পল্লীর পশু মনুষ্যেরা যেমন সাধারণ প্রজার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। নিষ্ঠুর দুষ্ট জমিদারগণ উপরের লোকে পল্লীর প্রতি সময়ে সময়ে যেরূপ অত্যাচার করে, তাহা মনে করিলে গায় না অকম্পিত হয়? ঐ সকল দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিতে কি কেউ নাই।
>
> (২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

'হিতকরী'-র সম্পাদক হিসাবে এক্ষেত্রে তাঁর যা ভূমিকা তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। মশাররফের স্বদেশানুরাগের একটাই সীমাবদ্ধতা ছিল ইংরেজ নীতির পন্থী তিনি কখনোই ছিন্ন করতে পারেননি। জীবন না দিয়ে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর গিয়েছেন।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-র শেষভাগ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাড়ি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি এ এক চূড়ান্ত আঘাত :

> নিকুঞ্জিনি পর গোরালাল সাহেব বুঝিল। গোরালাল চৌধুরী এবং কোম্পানির পক্ষ রক্ষার জন্য স্রোতস্বতী গঙ্গার সহিত রেলওয়ে কোম্পানির বিশেষ লড়াই বাধিল। ...বাঙ্গালা দেশের নদীর সহিত যদি বিলাতী বিজ্ঞান পরাস্ত হয়, তবে এ লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? হয় এসপার নয় ওসপার। গঙ্গাকে বিনাইয়া দিতে হইবে। সেই আড়াআড়ি বাঁধ। ...বাঁধ আরম্ভ হইল। তাহার নাম হইল "স্পার"।...কিন্তু স্পার টিকিল না। স্রোতে কোথায় উড়িয়া গেল তাহা অবধি কিছুই খবর রহিল না। (পরিণাম)

এই উদ্ধৃতাংশের মধ্যে এমন এক স্থির প্রশান্ত ভাব আছে যার স্পর্শে ধীরে ধীরে উঠে যায় যবনিকা। ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় স্বাজাত্যবোধ। এখানেই শেষ নয়, মশাররফের সৃষ্টি থেকে অর্থ করলে এমন আরও অনেক উদ্ধৃতাংশের সন্ধান পাওয়া যাবে যেখানে পরাধীনতার দুঃখ, স্বাধীনতার জন্য আকুতি, গভীর স্বদেশ প্রেমের বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> • দেশের ছেলে দেশের জিনিসে আদর না করিলে, দেশের জিনিস ভাল না বাসিলে তাহাকে নিমকহারাম ভিন্ন কি বলা যায়? আমরা বিলাতীনামে পাগল। বিলাতী ইঁদুর ভালবাসি, বিলাতী কুকুর পর্যন্ত কোলে করিয়া, তাহার মুখে মুখ দেই। যতদিন আমরা আপন আপন মর্যাদা না বুঝিব, আপন দেশকে আপন বলিয়া না ভাবিব, ততদিন আমাদের ভাল নাই। (হিতকরী, ৩০ বৈশাখ ১২৯৮)
>
> জন্মভূমি কাহার না আদরের। মনুষ্যের ত কথাই নাই, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গগণের জন্মভূমের মায়ামমতা বোঝে, —আদর ও যত্ন করে।...তাহাদের জন্মভূমি। (এসলামের জয়)
>
> • "প্রেম যে কি জিনিস, "প্রেম" কথাটি যে কত মিঠি তাহা বিলাতী অক্ষর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধ্য নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের প্রেমকে আমরা কেবল শব্দগুলেই বলিতে করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পুষিতে হয় তাহা জানি না।...আমরা নিমকহারাম, আমরা কৃতঘ্ন, তাহাতেই এই দশা। (উদাসীন পথিকের মনের কথা)
>
> • আজাদই যদি পরাজয় হইল, তবে গোলামী করিয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা জীবনপাত করাই শ্রেয়ঃ। ...পবিত্র জন্মভূমি অপরের পদানত হইলে কাহার হইবে, স্বাধীন জীবন পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধা, গলায় রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া নাকে নাকাল করিয়া বেড়াইবে, ইহা কোন প্রাণে সহ্য করিবে। (এসলামের জয়)
>
> ওরে ভারত আগ জাগ দিন গেল।/ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্বনাশ হইল।/(তোমার) টাকাকড়ি হিরামতি যা যেখানে ছিল।/যে পেল সে লুটেপুটে আপন ঘর ভরিল যে।/আপেল নামে কীপিয়াছে বসুকি পাতালে।/এখন দেখের বুক ফাটে নাহি বলতে পারেরে।। (সঙ্গীত লহরী)

এই স্বাজাত্যবোধের অনুরণনই যদি মশাররফের সাহিত্যে ও ব্যক্তিজীবনের শেষ কথা হত তবে তাঁকে আমরা স্থাপন করতে পারতাম আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধায়।

দুর্ভাগ্য, তেমন কোনো সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারছি না। তুলনামূলক বিচারে ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে মশাররফ যত অনেকেই ইংরেজ বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাঁর সুর তত উচ্চকিত না :

• [ব্রিটিশ] আজ রাজ্য ছাড়লে কাল আমরা মারা যাই, সাজ-পোষাক বাবুগিরী দিয়ে হজম হবে, বিরাট চালান বন্ধ করলে কি হয়? বাবুগিরী সাহায্য করতে কোথায় থাকে। এবং সুখস্ফূর্তির কোথায় যায়। (উদাসীন পথিক)

• ইংরেজ আমাদের রাজা ভাবুন। ইংরেজ আমাদের মাথার মণি। এই ইংরেজ আমাদের হর্তা-কর্তা বিধাতা। তাই ইংরেজ দেবতা, অমীয় অবতার।...ইংরাজকে অভিনয়-অবজ্ঞায় ভুল যায় না।...সেই ইংরাজকে জগতের শক্তির নমস্কার। ইংরাজের নির্বিঘ্ন রাজত্ব করুন, প্রজা পালন করুন, সময় মত আশীর্বাদ লাভ করুন, আমাদের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি। (গাজী মিয়াঁর বস্তানী)

ইংরেজের প্রতি আনুগত্যকে নাটকের মাধ্যমেও মেনে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, ইংরেজ বিরোধিতাকে অযৌক্তিক হিসাবে প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা লক্ষ করা গেছে তাঁর মধ্যে। ইংরেজদের বেতনভুক কর্মচারী দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' রচনা করে লোকের প্রশংসাভাজন হয়েছেন, এ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর তরফে আক্রমণ করেছেন :

দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের প্রজা, ইংরেজের নুন খাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজ মধ্যে যে দোষ-গুণ আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা কোন এবং অন্যায়ের বোধ আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ আজিও কেমন কড়ী খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী হইয়া তিনি জীবন কাটাইয়াছেন, উচ্চপদবিশিষ্টতা সেই ইংরেজ প্রদত্ত উচ্চপদ উপাধি ভোগ করিয়াছেন, অন্যকথা যে ইংরেজ রাজ্যে বাস করিয়াছেন, কেন সেই ইংরেজের নুন খেয়ে এখনও করিতেছেন, সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া দুন বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও দীনবন্ধুর বংশধরেরা বাহবা ভোগ করিতেছেন, ইহাদিগকে কি বলা যায়? (আমার জীবনী)

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ইংরেজ বিরোধিতা করার পাশাপাশি ইংরেজের স্বার্থের প্রতিপক্ষ যে কোনো ধরনের পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন মশাররফ। এমন কী দেশসেবার মতো মহান ব্রতকেও বাঁকা চোখে দেখেছেন :

রাজার অনুগ্রহ ভাবনা নাই। তিনিই ঐ সকল দেশ হিতকর সভায় যাইতে পারেন। দুঃখ উপন্যাসের চাঁদা মাথায় করিয়া গেছি দোকানীরা দেশের হিতৈষি, দেশের হিত সাধন সভায় বসিয়া কুটিলভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভা সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই। (আমার জীবনী)

এ সীমাবদ্ধতা শুধু মশাররফের একার না, তাঁর সময়ের অধিকাংশ অগ্রসর ব্যক্তিদের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতা ছিল। মশাররফ তাঁর যুগকে অতিক্রম করে যুগোত্তীর্ণ হতে পারেননি। এটি যদি আক্ষেপের কথা হয় তবে তাই।

কেবল আত্মচরিতের এ ইংরেজ প্রীতির প্রশ্নে না বাঙালি-জাতি সংস্কৃতি সংগঠনের ক্ষেত্রেও অজ্ঞতাপ্রসূত কিছু ভুল মশাররফের চলার পথকে কণ্টকিত করেছে। উনিশ শতকের

বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান নিরপেক্ষ সাধারণ বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনে পুরোধা ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা ছিল মশাররফের মধ্যে। 'মুসলমানী' বাংলার বিপরীতে দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীনভাবে সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা ভাষার ব্যবহার ও 'গো-জীবন', 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রভৃতির সূত্রে সে সম্ভাবনা অভিব্যক্ত হতে চলেছিল। কিন্তু মশাররফ শেষপর্যন্ত নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির ধারণা তাঁর কাছে একসময় কুয়াশাচ্ছন্নই থেকে গেছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় উন্নতির মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক উত্থান হবে, এমন পর্যায়ে এসে থেমে গেছে তাঁর ভাবনার রথ। মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে অন্য অর্থে মাদ্রাসা শিক্ষাকে বহাল রাখা ও তার উন্নতির জন্য আমরা তাঁকে জোর সওয়াল করতে দেখি। আমীর আলী মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যর্থতার কথা বলে এর আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলে মশাররফ প্রতিবাদে উচ্চকিত হন :

> The present system of Education is highly beneficial to the Musalman students in Bengal and I see no reason why a change should be introduced.

মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে বেরিয়ে এসে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য কোনো শিক্ষা পদ্ধতির ভাবনা তিনি ভাবতে পারেননি। এখানেই শেষ নয়, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে বাঙালি মুসলমান ছাত্রদের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে বলেও মতপ্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে :

> বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অবশ্যই হিন্দুর উপকার হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে মুসলমানের কোনরূপ উপকার নাই। বর্তমানশিক্ষাপ্রণালীর দোষেই বঙ্গীয় মুসলমানের আজ এই দুর্দশা।

সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেননি মশাররফ। তবে কথা হল, আজো কি কেউ তা করতে পেরেছেন। খুব সম্ভব নয়। ধর্মপরিচয়ের পোষাক খুলে রেখে হিন্দু বাঙালি মুসলমান বাঙালি নিছক বাঙালি হয়ে উঠতে পারেননি আজও। সাম্প্রদায়িকতার ধূম্র সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিতে পারে তেমন কোনো ফুল আজও ফোটেনি। তাই যদি হয়, তবে আর মশাররফের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলাদা করে মাথা ব্যথা করা কেন।

মীর মশাররফ হোসেন এর ব্যক্তিত্বে নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, রয়েছে বেনজির পিছুটান। তা সত্ত্বেও মশাররফ কোথাও কোথাও অসামান্য; সময়ের থেকে অনেক অগ্রবর্তী। বিশেষত সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ও ভূমিকার দিকটি। উনিশ শতকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পীড়নে পীড়িত বাঙালি মুসলমান সমাজ যখন সাম্প্রদায়িকতার চোরা জালে ক্রমশই নিমজ্জিত হচ্ছে তখন মশাররফ একক অদ্বিতীয় প্রায় ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্রোতের বিপরীতে পথ হেঁটেছেন। সাম্প্রদায়িকতার দূষণ থেকে সমাজমানসকে মুক্ত করার জন্য নিয়োজিত করেছেন নিজেকে :

এই কলকাতার হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই সমান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, স্বর্গে ছিল, কিন্তু মর্ত্যে ও স্বর্গে এক-একটা সামাজিকতাপূর্ণ ভাবি বা ঘটিবার আর পরিচয় পাই না। মুসলমানের সম্বন্ধে পরস্পরের সম্ভাব ছিল উল্লেখ নাই। মুস নাই, দেশ নাই, তাহার উপায় নাই। (শে-জীবন, প্রথম প্রকাশ)

বরং আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। তাহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে কেহই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাই একদিন—সমস্বর ডাকিব। (শে-জীবন)

এইপ্রসঙ্গে মশাররফ-চরিত্রের আরও একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজদেহে, শ্রমজীবী মানুষের অসহায়ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর সমালোচনা। 'টালা-অভিনয়'-এ এক্ষেত্রে মশাররফ মননের-বিস্তৃতি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে :

- আর সংসার চলে না। এক বেটাইতো দুটো কাজ মাথায় মোট বয়ে কতই উপার্জন করবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাদের আর চিঁড়ে, চিঁড়া মুড়ি চলবেই কি করে?
- অহংকার নিজেই তোমার মান। আমরা যদি, আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেতে পারি, বন জঙ্গল, মুড়োন-কুড়িয়ে করে নিই। আজেবার বাড়ি বসে খেলেই, হাতে বিছানা পেলেই অহংকার। আমরা জোগাড় না দিলে, আমরা মেহনত করে খাটি না বলে, তাঁরা অহংকার হবেন কোথা থেকে।

শ্রমজীবী সমাজের পক্ষ থেকে পুঁজিবাদী বিদ্রোহের উপর এমন প্রত্যাঘাতের দৃষ্টান্ত সেদিনের বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু এটা গৌণ। সবচেয়ে বড় কথা, 'টালা-অভিনয়' এর যা বিষয়বস্তু তার সঙ্গে এই অনুচ্ছেদ এক অর্থে বিচ্ছিন্ন। মশাররফ এমন অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র সন্ধান করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত থাকে মানুষের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার গভীরে। আর সে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা লালিত হয় সীমাহীন দুঃখ দারিদ্র্যে, বুভুক্ষু মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে। 'টালা-অভিনয়' আসলে বুভুক্ষু, নিরন্ন মানুষের ঐকান্তিক আর্তনাদের ঐতিহাসিক দলিল। 'সাম্য' বা 'বঙ্গদেশের কৃষক' নিবন্ধেরও সমাজবীক্ষণ প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক উচ্চারণ। তবে হয়তো বা, শ্রমজীবী মানুষের বুকের রক্তের উষ্ণ স্পন্দন এখানে তুলনায় তত ঘনিষ্ঠ নয়।

কথায় কথায় অনেক দূর এগিয়ে আসা হল। এবার সমুদ্র ডিঙানোর পালা। শেষ করার আগে আর একটি বিষয়ের প্রতি চোখ রাখা যাক। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজেদের মতো করে জীবনের একটা মানে খুঁজে নিই এবং সেই অনুসারে ছুটি সারাটি। জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করি। মশাররফের মধ্যেও তার অনুবর্তন রয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতার দিকটি হল নিজেকে নিজের মতো করে রচনা করে নেওয়ার পথেও তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অতৃপ্তির অস্থিরতা থেকেই গেছে। বিবি কুলসুমের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন একসময় চূড়ান্ত মাত্রা পায় :

> শরীর বা আর হয় নাশ হইল আমার শরীর, যে বাক্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন—মনুষ্যের রক্তমাংসের শরীরে তাহা কখনো সহ্য হইতে পারে না। প্রতি কথায় প্রতি মুহূর্তে আমার মনে কষ্ট দিয়া যাহা তাহার মুখে আসে তাহাই বলিয়া গালাগালি দিতেছে। (ডায়েরি)

ঘরে বাইরের প্রত্যেকের উপর বিশ্বাস হারান মশাররফ। আত্মবিশ্বাসের অভাব, বিশ্বাসহীনতা সব মিলিয়ে কেমন যেন এক নেতিবাচক বোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি। এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারেননি জীবনের শেষ দিনেও। এক অদৃশ্য, অসুস্থ মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে করতে ঘনিয়ে এসেছিল শেষের দিনটি। কিন্তু কেন? এমন পরিণতি কি মশাররফের জন্য সত্যিই অনিবার্য ছিল। এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়ার নয়। আমাদের মনে হয় মশাররফের পরিণতি আর যাই হক অস্বাভাবিক না। কেন অস্বাভাবিক না সেটাই এখন বলার। দার্শনিক প্রত্যয়ের যে বাণী ও শক্তিতে একটা মানুষ জীবনের হাজার অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সামঞ্জস্য রচনা করে নিতে পারেন মশাররফের মধ্যে তার অভাব ছিল। সেইঅর্থে কোনো দার্শনিক প্রতীতি তাঁর ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমাদের মতো সাধারণদের একজন। অনেক অসংগতির মধ্য দিয়ে পথ চলতে আমাদের যেখানে কোনো অসুবিধা হয় না সেখানে মশাররফের অসুবিধা হয়েছে। এই যা পার্থক্যের দিক। বলাবাহুল্য এই অসুবিধা তৈরি হওয়ারও সঙ্গত কারণ রয়েছে। চেতনার একটা দিক থেকে মশাররফ আমাদের মতো সাধারণ, অন্যদিকে রয়েছে তাঁর অসাধারণত্ব। শিল্পী তিনি, স্রষ্টা তিনি। সর্বব্যাপী সংবেদনশীল এক মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁকে। বাস্তবের মালিন্যে, কাঠিন্যে সতত ক্ষত হয়েছে সে মন। এমন অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য কবি-সাহিত্যিকরা নিজেকে ঘিরে একটা বাতাবরণ রচনা করে নেন। প্রকৃতির জল হাওয়া সেখানে তেমন করে দাগ কাটতে পারে না। বাইরের দোলায় সামান্য ঢেউ তোলে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে। মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> যাকে তোমরা ভালোবাসা বল সে রকম করে আমি কাউকে কোনদিন ভালোবাসিনি। বন্ধু বান্ধব, সংসার, স্ত্রী-পুত্র কোন কিছুই কোনদিন আমি তেমন করে আঁকড়ে ধরিনি। ভিতরে এক জায়গায় আমি নির্মম—তাই আজ যে জায়গায় এসেছি সেখানে আসা আমার সহজ হয়েছে। তা যদি না হতো, যদি জড়িয়ে পড়তুম তা হলে আমার সব নষ্ট হয়ে যেত।

এই যে প্রত্যয়, যে প্রতীতি তার নাগাল পাননি মশাররফ, আর এখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা। স্রষ্টা হিসাবে যা কিছু ব্যর্থতা তার উৎস এখানেই। জীবনের হিসাব মেলাতে না পেরে তিনি আত্মসমালোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। যে মহতী থেকে জন্ম হয়নি কোনো ফিনিক্স পাখির। যদি হতো তবে উত্তরকালের কাছে নিশ্চিতভাবে আরও উজ্জ্বল মূল্যে প্রতিভাত হতেন মীর মশাররফ হোসেন।

ISSN : 2348-3504
ডিসেম্বর ২০১৭

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : মুসলিম কবি ও কাব্য

এবং সংস্কৃতি

সম্পাদক
সাইফুল্লা
সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

ISSN : 2348-3504

এবং সংস্কৃতি

(পিয়ার রিভিউড জার্নাল)

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

মুসলিম কবি ও কাব্য

বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর, ২০১৭

কলকাতা

প্রকাশক
মীর রেজাউল করিম
৩৮, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪

যোগাযোগ -
চলভাষ-৮৬৫৭০৮৬৫৫১, ৯৪৩৪৮৮০২৪২
E.mail-samim.saifulla@gmail.com, raiakarimabu@gmail.com

উপদেষ্টা মণ্ডলী
অমলেন্দু চক্রবর্তী, অশোক উপাধ্যায়, উৎপল ঝা, চিত্তরঞ্জন লাহা, জাহিরুল হাসান, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, বারিদবরণ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহায়েল আলি খান, শেখ রহিম মণ্ডল, সত্যবতী গিরি, সুশীল বসু, সুমিতা মিত্র, স্বপন বসু

সম্পাদক
সাইফুল্লা, সুশান্ত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলী
অঞ্জনা বেতাল, আনিসুর রহমান, আব্দুর রহিম গাজী, আমজাদ হোসেন, আসমানি খাতুন, আশিস মুখোপাধ্যায়, উৎপল মণ্ডল, গৌতম দাস, চাঁদমালা খাতুন, বর্ণা বর্মন, জ্যোতির্ময় ঘোষ, বিশ্বনাথ মিশ্র, মমতাজ বেগম, মীর রেজাউল করিম

প্রচ্ছদ
প্রিয়ব্রত ভাণ্ডারী

অক্ষর বিন্যাস
মইনুদ্দিন মোল্লা, কদমগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা

মুদ্রণ
বর্ণায়ন, কলকাতা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলা বিভাগ-আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিরাম বুক স্টল, ধ্যানবিন্দু, বিশ্বজিৎ প্রকাশন, দেশ প্রকাশনী

বিনিময়-৪০০/-

সূচিপত্র

প্রাগাধুনিক বাংলা ও জাতিসত্তার আত্ম অন্বেষা : প্রসঙ্গ মুসলমান সমাজ
সুদেব ভট্টাচার্য ১১
প্রাগাধুনিক বাঙালি মুসলমান সমাজ : বর্ণবৈচিত্র্যের আলোকে
শেখ আবু তাহের কামরুদ্দিন ৩৫
বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মুসলিম মনন : প্রাগাধুনিক পর্ব
হাবিব আর রহমান ৪৫
বাংলা সাহিত্য : অভিযাত্রা, একটি দিক
মলয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫১
সুফি ধর্ম ও সুফি ধর্মচেতনা
মনোরঞ্জন সরকার ৬৩
মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা
রতনকুমার নন্দী ৭১
ভারতীয় সংস্কৃতিতে সম্প্রীতির ঐতিহ্য ও মুসলিম কবির বৈষ্ণব পদসাহিত্য
মিঠুন দত্ত ৭৮
সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে : প্রসঙ্গ মধ্যযুগের কাব্য পাঠ
সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ৮৮
প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য
মুসলিম কবিদের কাব্যকৃতির পরিপ্রেক্ষিত ও প্রবণতা
সাইফুল্লা ৯৫
প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য মুসলিম কবি ও কাব্য
আমিনুল ইসলাম ১১৩
মধ্যযুগের অনুশাসনমূলক কাব্যের ধারায়
মুসলমান কবি ও কাব্য
মর্জিনা খাতুন ২১৩
পূর্বরাগ-অনুরাগ ও প্রার্থনা পর্যায়ের পদে বাঙালি মুসলিম কবিদের কৃতিত্ব
আশরাফি খাতুন ২২৮

মুসলিম কবি-মানসের দর্পণে বৈষ্ণব রস সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান
সেক আনওয়ার হোসেন ২৪৭
মধ্যযুগের বাংলা গীত সাহিত্যে মুসলমান কবি
মমতাজ বেগম ২৫৩
মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের কাব্যে সুফীবাদ ভাবনা
কামরুজ্জামান ২৫৭
মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা কাব্যের উৎস সন্ধান
মিজানুর রহমান ২৬৪
উপেক্ষিত ইউসুফ জোলেখা
সুব্রত রায়চৌধুরী ২৯০
লায়লী মজনু : অন্তরঙ্গ পাঠ
ইমানুল আলি ৩০১
মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' : এক উজ্জ্বল প্রণয় আখ্যান
সোমা ভদ্র রায় ৩১০
সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ঐতিহ্য ও মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী কাব্য
এ টি এম সাহাদাতুল্লা ৩২১
দৌলতকাজী ও সতীময়না
আবু মোহা মণ্ডল ৩৩১
'স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি'
সেন্টুকুমার ঘোষ ৩৩৭
আলাওলের পদ্মাবতী : নিসর্গ প্রকৃতির শব্দচয়ন
মলেন্দু রায় চৌধুরী ৩৪৫
আবদুল হাকিমের লালমোতি সয়ফুলমুলুক : একটি অন্তরঙ্গ পাঠ
কাজী মাসুমা খাতুন ৩৫১
আলাওলের 'সিকান্দরনামা' : আগামী সূর্যের আলো
সুদীপ্তা মজুমদার ৩৬৬
কোরেশী মাগনের চন্দ্রাবতী : নিবিড় পাঠ
অমর কুমার পাল ৩৭১
বোঝা না বোঝার 'শাহজালাল-মধুমালা'
অনিকেত মহাপাত্র ৩৮২
চন্দন : জেবলতান শাহ উপাখ্যান
হাবিব রহমান ৩৯১
'জেবলতান শাহ উপাখ্যান' : মধ্যযুগের এক স্বতন্ত্র প্রয়াস
রবিউল আলম ৪০০

ইসলামি সাহিত্যের ধারায় সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'রাহাতুল কুলুব'
কাব্যের অবলম্বন ও ভূমিকা
আজিজুল হক ৪০৭
সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'রাহাতুল কুলুব'
মিজানুর মণ্ডল ৪১৫
নবীবংশ : সাধারণ পাঠ
শামসের মুনীর ৪২৪
সোনাভান : জনপ্রিয়তার উৎস সন্ধানে
তপন বসু ৪৩১
ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় : প্রাসঙ্গিক বিতর্ক ও কিছু কথা
শাহনে আলম ৪৪০
লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না : একটি ভাষাতাত্ত্বিক পাঠ
রমজান আলি ৪৫২
দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' : পক্ষপাতিত্বের আলোচনা
শেখ জাহিদ আকাশ ৪৬৩

পরিশিষ্ট-ক/৪৭৯
পরিশিষ্ট-খ/৪৮৩
পরিশিষ্ট-গ/৪৯৩

লেখক পরিচিতি ৪৯৫

সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ঐতিহ্য ও মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী কাব্য

এ টি এম সাহাদাতুল্লা

সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে হতে বিংশ শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়েছে বর্তমান পৃথিবী। বিজ্ঞান ও বিশ্বায়নের যুগ্ম প্রভাবে মানব সভ্যতা আজ অত্যন্ত গতিশীল। একদিকে অন্তর্জালের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব আত্মসমর্পণ করেছে মানুষের মুঠোর মধ্যে, অন্যদিকে গ্রহান্তরাভিযানমুখিনতার গতির কাছে হার মেনেছে দেশ কালের সীমা। জগৎসৃষ্টির সভ্যতার এহেন জয়যাত্রা যথেষ্ট ইতিবাচক বলে মনে হলেও সকলের নিবৃত্তি হয় না। বস্তুত আসলে এই সভ্যতাকে মানবিকতার উর্বরতায় ধরতে থাকলে একরাশ শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। জীবনযাপনের অত্যাধুনিক সামগ্রী মানুষের জীবনকে বহিরঙ্গে মসৃণ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তরকে করে দিয়েছে রুক্ষ ও যান্ত্রিক। অমানবিকতার বিষ বাষ্পে দগ্ধ হচ্ছে বর্তমান মানব সভ্যতা। মানুষের সুস্থ সমাজ জীবনে ভাঙন ধরেছিলো বিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই, একবিংশ শতাব্দীতে এসে তা করাল রূপ ধারণ করেছে। মানুষে মানুষে আত্মিক সম্পর্ক বলে আজ আর কিছু নেই। বিশ শতকের খ্যাতনামা কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর ১৯৪৬-'৪৭ কবিতায় মানুষের আত্মিক মৃত্যু নিয়ে বলেছিলেন--'সকলেই সকলকে আড়চোখে দেখে' কথাটি যে কতখানি সত্য তা একবিংশ শতাব্দীতে এসে সর্বাংশে উপলব্ধি করতে পারছি আমরা। এযুগের প্রতিটি মানুষ এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। আত্মস্বার্থ সিদ্ধির ঘূর্ণিবাত্যার প্রবাহের মুখে মিথ্যা হয়ে গেছে মানবিকতা, সামাজিকতা প্রভৃতি শব্দের মহিমা। সমাজে দিনে দিনে বাড়ছে নানা হানাহানির মতো ঘৃণ্য সব ঘটনা। তবে সভ্যতার এই ভয়াল রূপ সত্য, কিন্তু শেষ সত্য না। একদিন পৃথিবী এগিয়ে চলবে তার নিজস্ব গতিতে, মানুষ রচনা করবে মানবিকতার নতুন উপাখ্যান। সেই নতুন পৃথিবী সৃষ্টিতে সম্প্রীতির সাধনাই হবে মানুষের শেষ সাধনা। আর সে পথে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ পাথেয় হতে পারে মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী কাব্য।

কবি মুহম্মদ কবীর ফারসি বা হিন্দি সাহিত্য থেকে উপাদান গ্রহণ করে মধুমালতী কাব্যটি রচনা করেছেন বলে অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে কবির দুটি ভণিতা আমরা উল্লেখ করতে পারি-- ক. মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।/আছিল ফারসি ছন্দ রচিল পয়ারি।।

খ. এথি সুন্দর কিচ্ছা হিন্দিতে আছিল।/দেশি ভাষায় মুঞি পয়ারি ভণিল।।

নিশ্চিত রূপে বলা যায় না কবি ঠিক কোথা থেকে উপাদান নিয়ে এই কাব্য রচনা করেছেন।

তবে একথা নিশ্চিত যে, এ কাহিনি পুরোপুরি ভারতীয় না। কাব্যটির রচনাকাল নিয়েও সংশয় আছে। কাব্যের ভাষা ছন্দ নির্মাণ প্রভৃতি দেখে আমাদের মনে হয় এ কাব্য বেশ প্রাচীন। অনুমান করা যায় কবি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের কোনো এক সময় কাব্যটি রচনা করে থাকবেন। এমনিতে মধুমালতীর বিষয়বস্তু অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কাব্যটির আরও একটি দিকও বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয়টি হল সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ঐতিহ্য। কাব্যের নায়ক-নায়িকা হিন্দু। মূলত হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই কাব্য কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এ কাব্যের উৎস ফারসি বা হিন্দি কিতাব।

অর্থাৎ হিন্দি বা ফারসি ভাষায় কোনো মুসলমান কবি হিন্দু বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের প্রাথমিক পাঠ এভাবেই দেখতে পাওয়া যেতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অনেক দিক মধুমালতী কাব্যে নিহিত আছে। আমরা একে একে তার পরিচয় দেব। 'মধুমালতী' কাব্য হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ইতিকথা। ভারতবর্ষে মুসলিম সংস্কৃতি বহুমাত্রা পেয়েছিল। দীর্ঘকাল এদেশ শাসন করার কারণে ভারতীয় হিন্দু সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল মুসলমান রাজা ও তার পরিষদ দল। পাশাপাশি বসবাস ও বৈবাহিক সম্পর্ক এই প্রক্রিয়ার মূল কারণ। ইসলামি সংস্কার ও হিন্দু সাংস্কৃতিক পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছিলো এক মিশ্র সংস্কৃতির ভিত্তি। মূলত রাজপ্রাসাদের মধ্যে সমন্বয়ের সূচনা। বিদেশি রাজা নিজেদের স্বার্থে আপোষ করতে শুরু করেন দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে। ধীরে ধীরে এর প্রভাব রাজপ্রাসাদের সীমা ছাড়িয়ে সাধারণ সামাজিকের মধ্যে বিস্তৃত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে কবি সাহিত্যিকদের অবদানও যথেষ্ট। তাঁরা সমন্বয়ের ধারাকে আরও মসৃণ করার চেষ্টা করেন। আলোচ্য কাব্যে সেই প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন ভাবে। মুসলিম কবি মোহাম্মদ কবীর তাঁর কাব্য শুরু করেছেন —"সরস্বতীর পদে প্রণাম নমস্কার। পৃথিবী হইল নৌকা সাগর অপার।।"

সাধারণত দেব-দেবী বন্দনা মঙ্গলকাব্যের পরিচিত বিষয়। সমকালীন প্রায় সব কবি সরস্বতী বন্দনা করে কাব্য আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে এসেছে অন্যান্য দেবতার প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে মধুমালতী কাব্য কোনো ব্যতিক্রমী উদাহরণ নয়। কিন্তু যখন কোনো মুসলমান কবি হিন্দু দেবী সরস্বতীর পায়ে নমস্কার করে কাব্য আরম্ভ করেন তখন তা অবশ্যই ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। অনুমান করা যায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেদিন অনেক কবিই দেবী সরস্বতীকে বাগদেবী হিসেবে পূজা করতেন। শিল্পীদের কোনো জাতিগত পরিচয় থাকতে পারে না এমনটা হয়তো ছিল তাঁদের স্থির বিশ্বাস। শিল্প সাধনাই তাঁদের কাছে মূল কথা।

আলোচ্য ক্ষেত্রে কবি কবীর আপনাকে দূরে সরিয়ে শিল্প সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। দেবী সরস্বতী তাঁর পরম পূজ্য। কাব্যের সূচনায় তাই উপাস্যের পায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে ভক্তির প্রণাম। ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে কবি সম্পূর্ণ মুক্ত। যে কবি মনোজগতে এতটা উদার তাঁর কাব্য যে সম্প্রীতির সাধনা বিশেষ রূপে সংযোজিত হবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সহাবস্থানের চিত্র মধুমালতী কাব্যে বার বার ফিরে

এসেছে। জাতিগত সংহতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় কাব্য কাহিনির শুরুতেই। রাজা সূর্যভান ছিলেন অপুত্রক। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হন এবং যথাসময়ে পুত্র সন্তান প্রসব করেন। আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজসভা। আনন্দের এই মহোৎসবে বিশেষে মুগ্ধ হয়ে জাতিগত ভেদাভেদ— "আলিম পণ্ডিত যাতি ছোট বড় নাই। যত গুণী গুণি আইল আনন্দে বিভোর।।" এখানে লক্ষণীয় 'আলিম' শব্দটি। শব্দটি মুসলিম সংস্কৃতির পরিচায়ক। ইসলাম ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আলিম বলা হয়। আলিমরা ধর্ম প্রচারক বা ধর্মের সেবক হিসাবে সম্মানিত হন। হিন্দু রাজার আনন্দ অনুষ্ঠানে আলিমগণ সাগ্রহে যোগদান করেছেন, আবার হিন্দু রাজাও তাঁদের সাদরে বরণ করেছেন। কবির সমসাময়িক সময়ে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে জাতিগত সহাবস্থানের এমন মধুর চিত্র ছিল না বলেই মনে হয়। বরং এর উল্টো সুরের কথাই শোনা যেত কখনো কখনো। কবি এখানে সচেতনভাবে জাতিগত সমন্বয়ের কথামালা রচনা করেছেন। মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজের দুই প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিকে। যাদের দেখে প্রভাবিত হবে আপামর জনসমাজ। কবির স্বপ্ন সাধনার আর এক দৃষ্টান্ত— "ওলিগণে গণিতে লাগিল। /আনন্দে কুমারের সকল গুণিল।।"

ইসলামি সংস্কৃতিতে 'ওলি' শব্দের বিশেষ তাৎপর্য আছে। ইসলাম ধর্ম সাধনায় যারা সিদ্ধি লাভ করেন তাঁদেরকে ওলি নামে অভিহিত করা হয়। শব্দটি বিশেষণ পদ। মুসলিম সমাজে ওলিরা বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। সমাজের এমন ব্যক্তি জাত্যাভিমান ভুলে হিন্দু রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ গণনা করছেন। অন্যদিকে হিন্দু রাজাও তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের ভবিষ্যৎ গণনার দায়িত্বভার মুসলমান ওলির হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে উভয়ের উদারচেতা মনোভাব কবির স্বপ্ন সাধনার দ্যোতক হিসাবে প্রতিভাত হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের পথ ধরেই আসতে হয় সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথচলা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হিন্দু রাজদরবারে আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পেরে আপ্লুত আলিম, ওলিরা সাদরে বরণ করে নিয়েছেন হিন্দু সংস্কৃতিকে। ভবিষ্যৎ গণনা, কুষ্ঠী লেখা ইত্যাদি ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ। তা সত্ত্বেও মুসলমান ওলি আলিমরা সে কাজে সাগ্রহে অংশ নিয়েছেন। আসলে কবি যে সমাজের স্বপ্ন দেখেন সেখানে সংস্কৃতির কোনো জাতিগত পরিচয় থাকতে পারে না। কবি ভাবনার মূলে কাজ করে এক উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর কাছে মনুষ্যত্ব প্রথম পরিচয় মানুষ। এর অতিরিক্ত সামাজিক বা ধর্মীয় কোনো পরিচয়কে তিনি মান্যতা দেন না। এই উন্মুক্ত সাম্যবাদী চেতনা তাঁকে প্রাণিত করে হিন্দু -মুসলমান সংস্কৃতির সম্মিলনে। হিন্দু রাজা সূর্যভানের রাজসভায় ইসলামি সংস্কৃতির প্রবেশ তাই অবারিত হয়। রাজপুত্র মনোহর রাজপদে অভিষেক অন্তে রাজা-উজিরকে সালাম করেন— "রাজা উজিরেরে করিলা সালাম।" আমির, ওমরাহ, উজির ইত্যাদি শব্দ মুসলমান রাজদরবারে প্রচলিত ছিল। সাধারণত হিন্দু রাজদরবারে এই শব্দের উপাধি বা নাম ব্যবহার হত না। কিন্তু রাজা সূর্যভানের সভায় উপাধি বা নামগুলি খুবই প্রচলিত। হিন্দু রাজপুত্র রাজার আসনে অভিষেক নেওয়ার পর রাজা উজিরকে সালাম করছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে লক্ষণীয় 'সালাম' শব্দটি।

সম্পূর্ণ রূপে ইসলামি সংস্কৃতির দান এটি। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা পরস্পরের মধ্যে প্রাথমিক সম্ভাষণ হিসাবে 'আস সালামু আলাইকুম' (তোমার উপর আল্লাহতায়ালার রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক) এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন। এর সংক্ষিপ্তসার হল সালাম। 'করিলা সালাম' কথাটি থেকে বোঝা যায় হিন্দু রাজকুমার রাজপদে অভিষেক হতে গুরুজনদের সম্মান জানাচ্ছেন ইসলামি পদ্ধতিতে। কবির বর্ণনা থেকে আরও জানা যায়, সালাম জানানোর ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সাবলীল। অর্থাৎ সূর্যভানের রাজসভায় ইসলামি আদব কায়দার ব্যবহার সুপ্রচলিত। তাই মনোহরকে আলাদা করে তার বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে হয় না। কেবল সালাম জানিয়েই সে বাবা ও উজিরকে একসঙ্গে সম্মান জানাতে পারে। সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন কত নিবিড় হলে তবেই এমনটা হওয়া সম্ভব। হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদও ঘুচে গিয়েছে রাজা সূর্যভানের রাজসভায় —'আমির পণ্ডিত যতি ছোট বড় নয়।'" উক্তিতে 'ছোট বড় নয়' কথাটিও বেশ ইঙ্গিতবহ। বোঝা যায় যে সমাজে জাতিগত মেলবন্ধনের পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনও ছিলো বেশ দৃঢ়। রাজসভায় ধনি-দরিদ্র,উচ্চ-নিচ, নারী-পুরুষ সবারই ছিল সমান অধিকার। রাজা সূর্যভান সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে সমানভাবে শাসন ও পালন করতেন। তাই রাজ প্রাসাদের আনন্দ উৎসবে কেউ বাদ থাকে না। নিম্ন শ্রেণির মানুষ যেমন রাজসভায় ব্রাত্য না তেমনই নিম্ন শ্রেণির দেব দেবীকেও সম্মান করেন রাজা সূর্যভান—"রাজ্যে যত লোক ছিলো মঙ্গল গাহিতে আইল/ নাচি গীত বাদ্যের কল্লোল।।' 'মঙ্গল' শব্দটি অবশ্যই মঙ্গল গানকে ইঙ্গিত করে। মনসা, চণ্ডী,ধর্ম প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণির দেব-দেবীকে নিয়ে মধ্যযুগে রচিত হয়েছিলো মঙ্গল গানগুলি। রাজা সূর্যভান পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর উৎসবে মঙ্গল দেব-দেবীকেও স্মরণে বরণ করেছেন। যদিও যে সময়ে কাব্যটি রচিত হয় ততদিনে উচ্চবর্ণ বাঙালি সমাজে মঙ্গল দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে আলোচ্য ক্ষেত্রে সূর্যভানের রাজসভার বিশেষত্ব কোথায়? উত্তরে বলা যায়, মধ্যযুগে মঙ্গল দেব-দেবীকে উচ্চবিত্ত সমাজ পূজা করতো নিতান্ত বিপদে পড়ে। স্বেচ্ছায় কেউ পূজা করেননি। পূজার ক্ষেত্রে অধিকাংশের আদর্শ চাঁদ সওদাগর। রাজা সূর্যভান কিন্তু কোনোরকম বিপদের কারণে মঙ্গল গানের ব্যবস্থা করেননি। তিনি মঙ্গল দেব-দেবীকে সংকট মোচনের কাণ্ডারী বা ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক হিসাবেও ব্যবহার করেননি, বরং তাঁদেরকে নিজের আনন্দের সঙ্গিনী করেছেন। এখানেই তাঁর রাজসভার বিশেষত্ব।

মধুমালতী কাব্যের কাহিনি অনেকটা রূপকথার মত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি প্রভৃতি রূপকথা সংকলনে আমরা যে ধরনের গল্প পড়ে থাকি এ কাব্যের কাহিনিও অনেকটা সেরকম। তবে কাহিনিতে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে পরি বা জিন সম্প্রদায়। জিন-পরির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ইসলাম ধর্মে। 'আল কোরান' অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জীন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছিলেন। পরিদের জিন সম্প্রদায়ের অংশ বিশেষ বলে মনে করা হয়। জীন-পরিকে নিয়ে সৃষ্ট নানা গল্পকথা মুসলমান সমাজে বহুল প্রচলিত। জীনেরা অলৌকিক শক্তি, পরিদের অপরূপ রূপ সৌন্দর্য গল্পকথার মূল

সুর। কবি আলোচ্য কাব্যে মুসলমান সংস্কৃতির এই অলৌকিক বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েছেন বহুলভাবে। কাব্যে নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ, মিলন, বিচ্ছেদ সবটাই ঘটিয়ে পরীদের মাধ্যমে—" কন্যার পালঙ্ক পাশে কুমার পালঙ্ক।/পরী সবে থুইল নিয়া [দুই] এক সঙ্গ।/ সমানে রহিল দুই পালঙ্ক সুন্দর। সুর-শশী দুই কান্তি হৈল একস্তর।।"

এভাবেই মিলন হয়েছিলো মনোহর ও মধুমালতীর। প্রেম মিলনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলে ক্লান্ত নায়ক নায়িকা ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর পরীরা আবার তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়—"এ বোল শুনিয়া সবে ধরিয়া পালঙ্ক।/উড়াই কুমার লই যাএ পরী সঙ্গ।/যথাত উদ্যানে ছিল কুমার পালঙ্ক।/নিদ্রুতে রাখিল যাই তথা মনোরঙ্গ।।"কাব্য কাহিনির মূল আকর্ষণ মনোহর ও মধুমালতীর প্রেম। কবি এখানে মুসলমান সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতিকে সমান্তরাল সংগে ব্যবহার করেছেন। প্রেমের অনুতে আছে মুসলমান অনুষঙ্গ আর শেষে আছে হিন্দু পুরাণকথার প্রভাব — "তা দেখিয়া মহাদেবী মহামন্ত্র জপে তারি/ মন্ত্র পুত কন্যা শির পরে।/ মন্ত্র জোরে শুক হৈল দেখি কন্যা রঙ্গিল/পাখ-টেলা উড়িবারে যেরে।।" সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে মধুমালতীর মা মেয়েকে মন্ত্র পড়ে শুক পাখি করে দিয়েছে। শুক পাখি, মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রিত বিষয়। রাজকন্যা পাখমার ঘটনা কাব্যের একমাত্র উপকাহিনি। কাহিনিটি সর্বাংশে ভারতীয় রূপকথা অনুসারী। দৈত্য রাজকন্যাকে হরণ করে বন্দী করে রেখেছে। রাজপুত্র দৈত্যকে হত্যা করে তাকে উদ্ধার করছে এসবই ভারতীয় অনুষঙ্গ। যথা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য , হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে এখানে।

মধুমালতী কাব্যে উপমা ব্যবহার, ভাষা ব্যবহার প্রভৃতিতেও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সুর শুনতে পাওয়া যায়। উপমা ব্যবহারের সময় কবি হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মনোহরের তুলনা করছেন কবি — "অস্ত্র শিখিবারে দিল অস্ত্র-গুরু স্থান।/ যত অস্ত্র শিখিলেন্ত ইন্দ্রের সমান।।" মনোহরের রূপ বর্ণনার সময়ও ইন্দ্র, হরি, রাম ইত্যাদি হিন্দু দেবতার উপমা ব্যবহার করা হয়েছে —"সাজিলেন্ত কুমারের রূপ নাহি অন্ত যার/ইন্দ্র অতি লজ্জিত মদন।।/রত্ন-সিংহাসন মাঝ বসিয়া কুমার/হরি পাশে যেন থাকে রাম।" হিন্দু রাজকুমারের রূপ গুণ বর্ণনায় কবি হিন্দু দেবতার উপমা ব্যবহারের পাশাপাশি তার প্রেমের বর্ণনায় আরবি ভাষার প্রেম উপাখ্যান উপস্থাপন করছেন—"অবশ্য শুনিছ তুমি তাহার কাহিনি।/মজনের প্রেমভাবে অন্ত কামিনী।/পিরিতি ভাবে স্থান দিল কারবালের ভিল।/ কন্যা সনে যেন মতে হইয়াছিলো মিল।।" এইভাবে মধুমালতী কাব্য সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এক অনন্য উদাহরণে পরিণত হয়েছে।

মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী কাব্যটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম সম্পদ বলে আমরা মনে করি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত ইতিহাসকারগণের সুনজর থেকে এ পর্যন্ত বঞ্চিত হয়েছে কাব্যটি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যটির বিশেষ গুরুত্ব বর্তমান। সাহিত্যের পাতায় সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা ঘোষিত

হয়েছে খুব কম। মধুমালতী কাব্যটি এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাব্যটি না পাঠ করলে মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আশা করা যায়, অতঃপর সুধীজনেরা মধুমালতীর প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

গ্রন্থঋণ

আকর গ্রন্থ

১। মধুমালতী—মুহম্মদ কবীর, আহমদ শরীফ (সম্পা.), মুক্তধারা, ঢাকা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। [illegible] হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি—[illegible], বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২। ইসলামি বাংলা সাহিত্য—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৩। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান— দীনেশচন্দ্র সেন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
৪। বাংলা রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান—ওয়াকিল আহমদ, খান ব্রাদার্স, ঢাকা
৫। বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি—[illegible]
৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবি—আজহার ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মনন

Multi-Disciplinary & Peer-Reviewed Journal
Vol. 9th Issue 1st, January, 2019
UGC Approved Journal No. 40975

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

মনন

Multi-Disciplinary & Peer-Reviewed Journal
Vol. 9th Issue 1st, January, 2019
UGC Approved Journal No. 40975

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

মনন
গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৭৩

Manan

Multi-Disciplinary & Peer-Reviewed Journal,
Published & Edited by Sourabh Barman, Gobardanga, North 24 PGS, Pin - 743273, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 1st, January 2019, Rs. 250/-
E-mail : mananjournal2011@gmail.com
Website : manan.home.blog

প্রকাশ
৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২৮ জানুয়ারি, ২০১৯

কপিরাইট
সম্পাদক, মনন

প্রকাশক
মনন
সৌরভ বর্মন
গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৭৩
ফোন - ৯৮০৪৯২৫১৮২

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৫১৪৪৫

মূল্য
২৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৯

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে কথ্য বাংলা ভাষার উপস্থাপন : চারটি গল্পে

সুজিতকুমার পাল ১১

সময়, দুঃসময় ও বাঙালি সংস্কৃতি

সন্দীপকুমার মণ্ডল ২১

বেড়ি ওরাওঁ- প্রসঙ্গ জনজাতি গোষ্ঠী : বিভূতিভূষণের সাহিত্যে

মনোজ মণ্ডল ৩২

দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোধন' নাটকে দুর্গা

টুম্পা রায় ব্যাপারী ৪১

পাঁচগাছ কেন্দ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির কথা : প্রেক্ষিত উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

এ টি এম সায়মদুল্লা ৪৭

বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে তৎকালীন বিহার

অভীক প্রধান ৫৭

তারাশঙ্করের কবি উপন্যাসে প্রেমের স্বরূপ

অস্মিতা দে ৬৩

মতুয়া সংগীত

সুবেন্দু দত্ত ৭৪

শতবর্ষের আলোকে পুথি গবেষক বিভূপদ পাত্রা (১৯১৯ - ১৯৯৩)

শান্তনু মনাই ৮৭

গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

মৌসুমী বিশ্বাস ১০৩

মানভূমের সত্যাগ্রহ

সুব্রত পাত্র ১১০

গৌড়মল্লার: সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে

শতরূপা সরকার ১২৪

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্পে প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবহার

মাধব সরকার ১৫৪

পল্লী উন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ
তরুণ কান্তি মণ্ডল ১৪১

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে নারীকথা
উৎপলা পাইক মণ্ডল ১৪৭

রবীন্দ্রনাথ ও সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা
মৌ ভট্টাচার্য ১৫৪

যাত্রাগান : পূর্বা-পর
সেখ ওসমান খাঁ ১৭১

রবীন্দ্র-চিঠি পত্রে সঙ্গীত ভাবনা
শংকর প্রসাদ মাঝি ১৮০

বাংলা নাটকের গোড়ার কথা : প্রসঙ্গ নাটকের রূপ-রীতি-বিষয়
অনিন্দ্য প্রামাণিক ১৮৬

সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনে বিষ্ণুপুর ঘরানা
সুবর্ণা মুখার্জী ১৯৩

পথিক-কবির প্রেমিক সত্তার এক অংশ
নির্মাল্য মণ্ডল ১৯৭

ঔপনিবেশিক আমলে আধুনিক শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ
প্রসঙ্গ - জগৎবল্লভপুর জনপদ
অসিতকুমার কর ২০৪

রবীন্দ্রনাথের চিঠি পত্রের দর্পণে: আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ
তারাপদ বেরা ২১৭

জঙ্গলমহলের লৌকিকক্রীড়া ও সামাজিক ভাবনা
সুমন্ত মণ্ডল ২৩২

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে গণ-প্রতিরোধ
শান্তনুকুমার কর ২৪৪

চলিতভাষা বিতর্ক : রবীন্দ্রনাথ
সুশান্ত মুখোপাধ্যায় ২৫২

ত্রিপুরার গড়িয়াপূজা উৎসব : ঐতিহ্যে ও সাহিত্যে
জীবনকৃষ্ণ পাত্র ২৫৭

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে স্বদেশ চেতনা
সঞ্চিতা হাজরা ২৬৭

আলিগড়ের বাঙালি সম্প্রদায় ও তাদের ভাষা
মিজানুর রহমান ২৮২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী এবং আরণ্যক,
বিনির্দেশক-বিনির্দিষ্ট উপাদান বিশ্লেষণ সহ শৈলীগত বিভিন্ন দিক
মিঠু রায় ২৯০

তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা: পশ্চিমবঙ্গে কৃষি জমির অধিকার...
সুদীন সিনহা ৩০২

নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিকের
'পদ্মানদীর মাঝি' : প্রতি তুলনা
জ্যোৎস্না দত্ত ৩১৩

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সমাজ ভাবনায় বোলানগানের রংপাঁচালী
দীপক মণ্ডল ৩২৪

সাম্প্রতিক নদী বাঁধ সমস্যার একটি কল্পিত পূর্বরূপ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুক্তধারা"
দেবরাজ হাওলাদার ৩২৯

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক অনুষঙ্গ
শম্ভু মণ্ডল ৩৩৭

উত্তর দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতিতে রামকথার পরম্পরা
সঙ্গীতা প্রামানিক ৩৪৪

'বহিপীর' নাটক : মূল্যবোধের সংঘাত
আশিস রায় ৩৫৪

Bengal's Day of Challenge, Persistence and Sacrifice: A brief Historical Study
Ajanta Biswas ৩৬১

A Comparative Assessment on ICT Accessibility among the Government...
Nirmal Kumar Guchhait & Payel Banerjee ৩৮৮

From Above the Cloud Line
Aniruddha Sarkar ৩৯০

West Bengali Muslims Gaved For Partition
Chandrabali Das ৩৯৬

Place of Individual Liberty in Socio-Political Aspect
Kalpita Nandi ৪০৩

The British Colonial Motives Ånd Its Impacts On The Silk Industry...
Hoque Sabiruddin ৪১০

পাটচাষ কেন্দ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির কথা : প্রেক্ষিত উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

এ টি এম সাহাদাতুল্লা*

কৃষিকাজ মানুষের বহু প্রাচীন জীবিকা। শিকার ও আহরণ মূলক জীবিকার সীমা অতিক্রম করে কোন সুদূর অতীতে আমাদের পূর্ব পুরুষরা কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছিল তা সঠিক করে বলা যায় না। সভ্যতার অগ্রগতির পথে বিশেষ এক মুহূর্তে কৃষিকাজকে আশ্রয় করেছিল সেদিনের যাযাবর জীবন নির্ভর অরণ্যচারী মানুষ। অতঃপর মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে গিয়েছে কৃষিকাজ। আহরণমূলক ও শিকারধর্মী জীবিকার মধ্যে কমবেশি অনিশ্চয়তা ছিল। শিকার করতে গিয়ে প্রতিদিন যথাযথ শিকার পাওয়া ছিল অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজন তো আর কিছু দিয়ে মেটানো যায় না বা খাদ্য ছাড়াও কাটানো যায় না একটা দিন। ফলে সেদিন আমাদের প্রপিতামহদের আলাদা করে ভাবতেই হয়েছিল; আর তারই প্রেক্ষিতে উদ্ভব হয়েছিল কৃষিকাজের।

প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতার যে পথ চলা শুরু হয়েছিলো বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করে তা বর্তমানে বাণিজ্যিকতার যুগে উত্তীর্ণ হয়েছে। মানব সভ্যতার এই বিবর্তন কোনো সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়নি। নানারকম ওঠা পড়া, ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে মানব সমাজ। মানুষের সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের পথে কৃষি সংস্কৃতিও বদলে গিয়েছে বারে বারে। তবে সে বদল অবশ্যই সুস্থির ধারায় সমান্তরাল পথে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি সংস্কৃতির রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। একটা সময় কাঠের তৈরি লাঙল দিয়ে জমিতে চাষ দেওয়া হত। লোহা ও আগুন আবিষ্কারের পর কাঠের লাঙল অপ্রচলিত হয়ে যায়, তৈরি হল লোহার ফালযুক্ত লাঙল। এই ভাবে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, কৃষি পদ্ধতি, ফসল উৎপাদন সবকিছুতেই লেগেছে নতুনত্বের রং। পঞ্চাশ বছর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র আর বর্তমানের কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে দেখা যায় বিস্তর পার্থক্য। এই পার্থক্য একদিনের বিষয় নয়। এ হল চাষবাস নিয়ে মানুষের দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল। তবে কেবলমাত্র চাষবাস নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণেই কৃষি সংস্কৃতিতে বিবর্তন আসেনি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনও। এই প্রেক্ষাপটেই

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ (সান্ধ্য)।

আমরা তুলে ধরবো পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পাট চাষ ও পাট সংস্কৃতির বিবর্তনের চালচিত্রকে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেরও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিশাল অংশ জুড়ে আছে কৃষিকাজ। সুদীর্ঘ কাল ধরে এরাজ্যের মানুষ কৃষিকাজকেই তাদের জীবন জীবিকার বিশেষ অবলম্বন হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে এবং আজও তার ধারা সমানভাবে বিদ্যমান। জেলা হিসাবে উত্তর ২৪ পরগণার কৃষি-সংস্কৃতিও বহু পুরনো। বিশেষ কিছু ফসল যেমন ধান ও পাট উৎপাদনে এই জেলা রাজ্যের মধ্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করেছে বহুদিন। পাশাপাশি সবজি চাষে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। বহু বিচিত্র ধরনের সবজি এখানে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগও এই জেলায় বেশি হচ্ছে। মোটকথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কৃষি সংস্কৃতি বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। এই বৈচিত্রপূর্ণ কৃষি সংস্কৃতির একটি বিশেষ অধ্যায় হল পাট চাষ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় পাট চাষের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। একটা সময় জেলার প্রায় অধিকাংশ জমিতেই পাট চাষ করা হত। পাটের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের আত্মিক যোগ বর্তমান। এই সেদিন পর্যন্ত এখানে কৃষকরা মনে করতো এক বা দুই বিঘে জমিতে পাট চাষ করতে পারলে সারা বছর হেসে খেলে চলে যাবে। কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য ছিল। কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও পাটের বাজার মূল্য ছিল যথেষ্ট। দুই বিঘা জমির পাট বিক্রি করে যে নগদ অর্থ পাওয়া যেত তা দিয়ে বছর ভর দৈনন্দিন সংসার চালিয়ে নিতে বিশেষ সমস্যা হত না। বর্তমানে পাটের বাজার দর ক্রমান্বয়ে পড়তির দিকে। এতে চাষিরা ক্রমশ পাট চাষের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। তবে তারপরেও অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। রয়েছে জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পাট-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ প্রতিফলন।

জেলার পাট চাষ পদ্ধতি ও প্রসঙ্গ কথা

পাট চাষের সাধারণ রীতি অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেও চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জমিতে পাটের দানা বপন করা হয়। জমির উর্বরতা শক্তি, উচ্চতা, জলের পরিমাণ প্রভৃতির নিরিখে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জমির উর্বরতা ভালো হলে এবং জমিতে জলের যোগান যথাযথ থাকলে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাষের পত্তন নেওয়া হয়। অন্যথায় চৈত্র মাসের শেষে বা বৈশাখের শুরুতে প্রথম বৃষ্টি নামলে তবে জমিতে লাঙল নামানো হয়। পাট চাষের জন্য খুব ভালো করে লাঙল দিতে হয়। দুই বা তিনবার হাল চালিয়ে, তার উপর মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাটের জমিতে কমবেশি জৈব সার প্রয়োগ করা হত। এখন জৈব সারের প্রয়োগ প্রায় নেই; রাসায়নিক সারেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। জেলার কৃষকরা পাটবীজ নিজেরা তৈরি করেন না।

বাজার থেকে কিনে আনেন। গ্রামের মধ্যে কেউ কেউ অনেকক্ষেত্রে মহাজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বৃষ্টির পর জমি প্রস্তুত করে পাটবীজ বপনের তাড়া থাকে সকলেরই। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল সংগ্রহের জন্য তাই একটা যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অন্যঅর্থে উৎসবের মেজাজ সৃষ্টি হয়। রোপনের পরে শুরু হয় পরিচর্যার পালা। যথাসময়ে বীজ থেকে চারা হয়। চারাগাছ বেশ একটু বড় হলে নিড়ে দেওয়া-র দরকার হয় অনেক সময়। নিড়ে দিতে হোক বা না হোক নিড়াতে কিন্তু হবেই। প্রয়োজন মতো সময়ে সময়ে সার দেওয়া হয়। একটি সময়ে গাছ বড় হয়ে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন তা কর্তন করে জলে ভিজানোর ব্যবস্থা করতে হয়। সাত থেকে দশ দিন জলে ভিজান থাকার পর পাটকাঠি থেকে আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে শুকাতে দেওয়া হয়। অতঃপর সময় মতো তা বাজার জাত করা হয়।

পাট চাষ সংশ্লিষ্ট সমাজভাষা

ক) পদ্ধতি বিষয়ক

জো হওয়া

পাট চাষের জন্য জমিকে উত্তম পরিমাণে কর্ষণ করা আবশ্যক। মাটি খুব ভিজে বা শুকনো থাকলে এই কর্ষণ করা চলে না। না শুকনো, না ভিজে এমন অবস্থাতে জমিতে পাটচাষের জন্য লাঙল চালাতে হয়। জমির এই বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় জো হওয়া।

মই দেওয়া

লাঙল চালানোর পর জমির উপরিভাগ অসমতল হয়ে পড়ে। এই অসমতল জমিকে সমতল করার জন্য মই দেওয়া হয়। লাঙল দেওয়ার সময় যেমন গরুর কাঁধে থাকা জোয়ালের সঙ্গে লাঙলের একাংশ সংযুক্ত থাকে মই দেওয়ার ক্ষেত্রেও তেমনি জোয়ালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটা মইকে জুড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর কৃষাণ ওই মই এর উপর উঠে দাঁড়ান। গরু চলতে থাকলে কৃষাণের শরীরের চাপে মই এর নিচের মাটি ক্রমশ সমান হয়ে যায়।

বোনা

পাটের দানা সরাসরি ছড়ানো হয়। হাতের মুঠোয় দানা নিয়ে তা বিশেষ কায়দায় জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কাজকে বলা হয় পাট বোনা।

নিড়ে দেওয়া

দানা ছড়ানোর পর চারা বার হলে কিছু দিন পর পাটের জমিতে নিড়ে দিতে হয়। জমির কোনো জায়গায় যদি চারার পরিমাণ খুব বেশি থাকে তবে তার কিছুটা তুলে ফেলতে হয়। তা না হলে পাটের বৃদ্ধি ভালো হয় না। যে বিশেষ পদ্ধতিতে পাটের চারা গাছ কিছুটা তুলে ফেলা হয় তাকে বলে নিড়ে দেওয়া। লোহার কতকগুলো শলাকাটি একটা কাঠের

সঙ্গে আটকানো থাকে। একে বলে বিদেকাঠি। জমিতে লাঙলের মতো করে বিদেকাঠি টানলে বিদের দাঁতে আটকে কিছু চারা উঠে আসে। এতে জমির পরিমাণ ও চারার মধ্যে সমতা রক্ষা হয়।

নিড়ানো

জমির আগাছা পরিষ্কার করাকে নিড়ানো বলা হয়। পাটের জমিতে নিড়ানোর ক্ষেত্রে নিড়ানি ব্যবহার করা হয় প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ পাটের চারা যখন ছোটো অবস্থায় থাকে। পরে গাছ বেশ বড় হয়ে গেলে নিড়ানি বা ওই জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

পাট কাটা

পাট গাছের বৃদ্ধি যথাযথ হওয়ার পর তা বড় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়। পাট কাটার জন্য যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে 'হেঁসো' বলে।

বালি দেওয়া

হেঁসো অত্যন্ত ধারালো না হলে তা দিয়ে পাট কাটা যায় না। এমনিতে হেঁসো সারা বছর সেভাবে ব্যবহৃত হয় না। তাই পাটকাটার আগে তাকে আলাদা করে ধার দিয়ে নিতে হয়। বালি সহযোগে হেঁসোয় ধার দেওয়া হয়। তাই ধার দেওয়া অর্থে সাধারণভাবে 'বালি দেওয়া' বলা হয়।

পাতা ঝাড়া

পাট গাছ কাটার পর তা জমিতে কয়েক দিন ফেলে রাখা হয়। এই সময় গাছের পাতা পচে যায়। পাট পচাতে দেওয়ার আগে ঝাড়া দিয়ে ওই পচা পাতা ঝরিয়ে ফেলতে হয়। এই কাজকে বলা হয় পাতা ঝাড়া।

বোঝা করা

পাটগাছ পচাতে দেওয়ার জন্য কোনো জলাশয়ে নিয়ে যেতে হয়। আর এর জন্য কিছু পরিমাণ পাট গাছ একসঙ্গে বেঁধে এক একটা বান্ডিল করা হয়। এই বান্ডিলকে বলা হয় বোঝা। প্রতি বোঝায় এমন পরিমাণ পাট গাছ থাকে যাতে একজন মানুষ তা সহজে মাথায় করে বহন করতে পারেন।

জাগ দেওয়া

পাট গাছ থেকে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পথে এক বিশেষ পর্যায় হল জাগ দেওয়া। জলের নিচে বেশ কিছুদিন যাবৎ পাটের বোঝাগুলিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। ডুবে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পাটের বোঝার উপর উপযুক্ত পরিমাণে কাদার বা অন্য কিছুর ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত বিষয়টিকে এককথায় বলা হয় জাগ দেওয়া।

জাগ ভেসে যাওয়া

জমির পাশাপাশি কিংবা অন্যান্য জলাশয় না থাকলে কৃষকরা নদী বা খালে পাট জাগ দেয়। সেক্ষেত্রে জলের স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয়ে তারা দড়ি দিয়ে নদীর ধারের শক্তপোক্ত কিছুর সঙ্গে জাগটাকে বেঁধে রাখে। তবে অনেক সময় অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে অনেক সময় নদী বা খালের জলের স্রোত বেড়ে গিয়ে দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে যায়। এতে জলের স্রোতে ভেসে যায় পাটের জাগ। একেই জাগ ভেসে যাওয়া বলা হয়।

ভাসা জাগ ধরা

ভেসে যাওয়া জাগ কারও না কারও নজরে পড়ে। তিনি তখন সেটিকে ধরার চেষ্টা করেন। ভাসা জাগ ধরা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। জলের স্রোতের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে তবে ভাসা জাগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। যদি মালিক পক্ষের সন্ধান না পাওয়া যায় তবে যিনি ধরে রাখেন ভাসা জাগের মালিক তিনিই হন।

পাট ধোয়া

জাগ দেওয়ার কিছুদিন পর পাট পচে যায়। পচা পাটের গাছ থেকে পাটের আঁশ ও পাট কাঠি আলাদা করাকে বলা হয় পাট ধোয়া।

পেটা পাট

এটি পাট ধোয়ার একটি পদ্ধতি। এক্ষেত্রে এক বা দেড় ফুট লম্বা কাঠের টুকরো দিয়ে প্রথমে পচা পাটের গোড়ায় আঘাত করা হয়। তারপর পাটগাছের মাঝ বরাবর ভেঙে পাট কাঠির কিছুটা টেনে বার করা হয়। পরে অবশিষ্ট অংশ ধরে পাটের আঁশ আলাদা করা হয়। এই পদ্ধতিতে পাট ধুলে এর রং ভালো হয়, কিন্তু পাট কাঠি ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যায়।

ছাড়ানো পাট

এই পদ্ধতিতে পচা পাটের গোড়া থেকে হাত দিয়ে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে পরে টেনে টেনে পাট কাঠি বার করা হয়। এতে পাট কাঠি অক্ষত থাকে। তবে এই পদ্ধতিতে ধুলে পাটের গুণগতমানে সামান্য ঘাটতি হয়। এতে এর বাজার মূল্য একটু কমে যায়।

নাড়ি

পাট ধোয়ার সময় সাধারণভাবে চারটে-ছটা করে গাছ একসঙ্গে ধোয়া হয়; যাতে ওগুলিকে সহজে হাতের মুঠোয় ধারণ করা যায়। পরে ওই একমুঠো পরিমাণ আঁশকে একসঙ্গে রাখা হয় এবং তাকে নাড়ি বলা হয়। এক একটি নাড়ি আলাদা আলাদা ভাবে শুকাতে দেওয়া হয়।

ছড়পা

নাড়ির বৃহত্তর রূপ হল ছড়পা। কয়েকটি নাড়ি একত্রিত করলে হয় ছড়পা। সাধারণত

ভিজে পাট শুকিয়ে যাওয়ার পর তড়পা তৈরি করা হয়। তপড়াগুলি থরে থরে সাজিয়ে রেখে বাজারজাত করার আগে পর্যন্ত যত্নের সংরক্ষণ করা যায়।

হাজা দেওয়া

প্রথমে পাটের আঁশের মতো পাটকাঠিও ভিজে থাকে। ভিজে পাটকাঠিকে বিশেষ পদ্ধতিতে শুকাতে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির অন্যনাম হাজা দেওয়া। এক্ষেত্রে অনেকগুলো পাটকাঠি একসঙ্গে করে মাথার দিকে বাঁধা হয়। তারপর ঐ গোছা মাটিতে দাঁড় করিয়ে পাটকাঠির গোড়াগুলো একটু দূরে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে পাটকাঠিগুলো মাটিতে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে এবং অনেকটা পিরামিডের মত দেখতে হয়।

বওয়া

বহন করা-র সংক্ষিপ্ত কথিতরূপ বওয়া। পাট চাষের ক্ষেত্রে বওয়া বহুলভাবে ব্যবহৃত শব্দ। কেননা নানাস্তরে বওয়া-র প্রশ্ন আসে। জাগ দিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাটের বোঝা বহন করতে হয়। তারপর ভিজে পাট ও পাটকাঠি বাড়িতে আনা সহ শুকনো পাট বাজারে নিয়ে যাওয়া সবই বওয়া বা বহন করা নির্ভর।

ঘ. উপজাত দ্রব্য বিষয়ক

পাকাটি

আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পর পাটগাছের যে অবশিষ্ট অংশ থাকে তাই পাটকাঠি বা পাকাটি। পাটকাঠি মূলত জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে বেড়া দেওয়া বা অন্য অনেক কাজেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

গোড়ালে-আগালে

পাটকাঠির অংশ বিশেষ। পেটা পদ্ধতি পাট ধোওয়া হলে পাটকাঠি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর প্রথম ভাগ অর্থাৎ গাছের গোড়ার দিকের অপেক্ষাকৃত মোটা ও শক্ত অংশকে বলা হয় গোড়ালে। অন্য অংশ অর্থাৎ অগ্রভাগের সরু দুর্বল অংশকে বলা হয় আগালে। আগালের তুলনায় গোড়ালের বাজার মূল্য বেশি হয়।

পাট শাক

কচি পাট গাছের পাতা অনেকক্ষেত্রে শাক হিসাবে রান্না অথবা ভাজা করে করে খাওয়া হয়। খাওয়ার যোগ্য কচি পাটের পাতাই হল পাট শাক।

ফেলো

অনেক সময় সব পাটগাছের উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি হয় না। কিছু গাছ অপেক্ষাকৃত সরু ও ছোটো হয়ে কিছুদিন পর শুকিয়ে যায়। এই সকল গাছ থেকে পাটের আঁশ ছাড়ানো যায় না। একে ফেলো বলা হয়। ফেলো মূলত জ্বালানির কাজে ফেলো ব্যবহৃত হয়।

গোঁজা

পাট গাছ কেটে নেওয়ার পর গাছের গোড়ার দিকে কিছুটা অংশ মাটির নিচে থেকে যায়। মাটির নিচে থাকা এই অংশকে বলা হয় গোঁজা। পরবর্তী চাষের জন্য জমিতে পুনরায় লাঙল দেওয়া হলে গোঁজা মাটির উপর উঠে আসে এবং তখন তা জ্বালানির জন্য সংগ্রহ করা হয়।

কেসো

পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পরও পাট কাঠির গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু জড়িয়ে থাকে। ঐ সূক্ষ্ম তন্তুগুলিকে ছাড়িয়ে এক জায়গায় করলে তাকে বলা হয় কেসো। 'নাতা' দেওয়ার কাজে কেসোর বহুল ব্যবহার বর্তমান। নাতা দেওয়া হল ঘর বা উঠোনের উপর কাদা মাটির প্রলেপ দেওয়া।

গ. ব্যবহৃত উপকরণ বিষয়ক

ধান বা অন্যান্য চাষে যেসব সাধারণ উপকরণ ব্যবহৃত হয় পাট চাষেও সেগুলি ব্যবহার করা হয়। তবে পাট চাষ করার জন্য কিছু অতিরিক্ত উপকরণ ব্যবহার করার দরকার পড়ে। এগুলি হল—

হেঁসো

এটি কাস্তের মত দেখতে কিন্তু কাস্তের থেকে অনেক বড় আকারের ধারালো অস্ত্র। এতে কাস্তের মত দাঁত থাকে না। হেঁসো পাট কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বিদে কাঠি

তিন বা চার ফুট লম্বা কাঠের পাটাতনে লোহার ফলা গেঁথে বিদে কাঠি তৈরি করা হয়। পাটের জমিতে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলার কাজে বিদে কাঠির ব্যবহার বর্তমান।

বেড়ন

এটি পাট ধোয়ার একটি উপকরণ; পেটা পদ্ধতিতে পাট ধোওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বেড়ন হল এক ফুটের মতো লম্বা শক্ত কাঠ। বেড়ন দিয়ে পিটিয়ে পাটকাঠি আর আঁশ আলাদা করা হয়।

আড়া

ভিজে পাট শুকনো করার জন্য আড়াতে মেলে দেওয়া হয়। দুটো শক্ত বাঁশ মাটিতে লম্বালম্বি পুঁতে তার উপর আড়াআড়ি ভাবে একটি লম্বা বাঁশ বাঁধা হয়। ঐ আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা বাঁশে পাট মেলে দেওয়া হয়। পাট মেলে দেওয়ার উপযোগী বাঁশের কাঠামোকে আড়া বলা হয়।

ঘ) অন্যান্য

গাদা দেওয়া

ভিজে পাট শুকিয়ে যাওয়া মাত্র চাষিরা তা বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যান না। কখনো কম সময়, কখনোবা দীর্ঘদিনের জন্য তা ঘরে সংরক্ষণ করা হয়। পাট ও পাটকাঠি সংরক্ষণ করা হয় যে পদ্ধতিতে তারই অন্যনাম গাদা দেওয়া।

ছাটা

ছাটা হল পাটকাঠি কেনাবেচার ক্ষেত্রে পরিমাপের একক। দুই হাত, আড়াই হাত, তিন হাত ইত্যাদি নানা মাপের দড়ি বা পাটের ছালকে ব্যবহার করা হয় ছাটা হিসেবে।

উত্তর ২৪ পরগনা-র পাট-সংস্কৃতির সেকাল একাল

একসময়পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-অর্থনীতির ভরকেন্দ্র ছিল হুগলী শিল্পাঞ্চল। আর হুগলী নদীর উভয় তীরে গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চলের মূল শিল্পই ছিল পাট শিল্প। হুগলী নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর বারাকপুর, জগদ্দল, শ্যামনগর, নৈহাটি এলাকায় ছিল বহু চটকল। মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন-জীবিকার বিশেষ আশ্রয় ছিল এই চটকলগুলি। চটকলে শ্রমিকের কাজ থেকে শুরু করে কেরানীর কাজে যুক্ত ছিলেন অজস্র মানুষ। বাঙালি সংস্কৃতিতে চটকলের বাবু কালচার প্রচলন হয়েছিল এইসূত্রেই।

হুগলী শিল্পাঞ্চলের চটকলগুলিতে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। জেলার কৃষকরা পাটের মরশুমে অন্য কোনো চাষ করতেন না; শুধু পাটচাষে মনোনিবেশ করতেন। তখন পাটের বাজার ছিল যথেষ্ট ভালো। কৃষকরা পাট চাষ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারতেন। পাশাপাশি গ্রামের অনেক মানুষ কৃষকদের থেকে পাট কিনে তা চটকলে সরবরাহ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পাট চাষের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এক বিশাল জনগোষ্ঠী। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

বর্তমানে হুগলী শিল্পাঞ্চল তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছে। একের পর এক বন্ধ হয়েছে বিখ্যাত চটকলগুলি। তখন গ্রাম থেকে বারাকপুর অঞ্চলে এসে কাজ করতেন অগণিত মানুষ। তারা মেস করে থাকতেন। এতে গড়ে উঠেছিলো মেস সংস্কৃতি। এখন চটকলের শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে ওঠা মেস বিশেষ দেখতেই পাওয়া যায় না। যে সমস্ত চটকল আজও চলছে তার শ্রমিকরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আসলে চটকলের পূর্ব গৌরব না থাকায় এখন শ্রমিকের চাহিদা খুব কমে গিয়েছে। ফলে দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে বিশেষ কেউ আর চটকলে কাজ করতে আসছেন না

যাইহোক, পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতেও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে পাট ও পাটের বিভিন্ন অনুষঙ্গ। আমরা আগেই বলেছি, একদা এই জেলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ছিল পাটের বহুমুখি ব্যবহার। গ্রামের হত দরিদ্র থেকে শুরু করে সম্পন্ন পরিবার সকলের বাড়িতে পাটকাঠি ছিল জ্বালানির প্রধান উপকরণ। এমনিতে গ্রামের মানুষের জ্বালানির অভাব বিশেষ ছিল না। চাষবাসের উপজাত দ্রব্য, গাছের ডালপালা, এসব দিয়ে প্রয়োজনের বেশ কিছুটা মিটে যেত। সঙ্গে থাকত পাটকাঠি। তবে এসবই ছিল সাধারণ সময়ের জন্য। বর্ষাকালে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হত। তখন জ্বালানির অভাব দেখা দিত। এই অভাব পূরণ করার ক্ষেত্রে পাটকাঠি ছিল প্রথম ও প্রধান সহায়ক। কৃষক পরিবার মাত্রেই তাই কমবেশি পাটচাষ করা হত। অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা যেত, পাট বিক্রি করে অর্থ উপার্জন উপলক্ষ মাত্র, মূল লক্ষ জ্বালানি হিসেবে পাটকাঠি সংগ্রহ। বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য পাটকাঠি সংরক্ষণ করা হত বিশেষ করে। যে পদ্ধতিতে পাটকাঠি সংরক্ষণ করা হত তাকে বলা হয় পালা দেওয়া। পাটকাঠির গাদা এমনভাবে দেওয়া হত যাতে তার মধ্যে জল প্রবেশ করতে না পারে। সবাই এই কাজ সঠিকভাবে করতে পারতেন না। যারা পারতেন তারা সমাদৃত হতেন। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাড়িতে বাড়িতে রান্নার গ্যাস ঢুকে পড়েছে। পাটকাঠির প্রয়োজনীয়তা কমেছে অনেকাংশে। এখন আর জ্বালানি কাঠের লক্ষ্যে পাট চাষ করা হয় না। পাটকাঠির পালা-ও আর সেভাবে চোখে পড়ে না। একটা সময় ছিল যখন পাটকাঠির কেনাবেচা চলত আর পাঁচটা দ্রব্যের মতোই। তবে পাটকাঠি বেচা কেনার ব্যাপারে মেয়েদেরই ছিল অগ্রাধিকার। ছেলেরা এ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা করতেন না।

এই সেদিন পর্যন্ত গ্রামে যাদের পাটচাষ করা বা পাটকাঠি কেনার সামর্থ্য থাকত না তারা পাটকাঠি নেওয়ার শর্তে বিনা পারিশ্রমিকে অন্যের পাট ধুয়ে দিতেন। একে বলা হত 'পাট ধুয়ে নেওয়া'। বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা হওয়ায় পাট ধুয়ে নেওয়ার বিষয়টি আর সেভাবে প্রচলিত নেই। আগামী দিনে এর সম্পূর্ণ অবসান হবে হয়তো। একটা সময় পর্যন্ত জেলার বাচ্চাদের খেলাধুলার অন্যতম সামগ্রী ছিল পাটকাঠি। পাটকাঠির গাদার মধ্যে লুকিয়ে লুকোচুরি খেলা খেলতো বাচ্চারা। পাটকাঠি দিয়ে খেলাঘর তৈরি করা, লম্বা পাটকাঠি দিয়ে নানা রকম সামগ্রী তৈরি এসব ছিল জেলার বাচ্চাদের অতি পরিচিত ও ভালোবাসার বিষয়। খেলতে খেলতে ছোটোরা অনেক পাটকাঠি নষ্ট করতো; বড়রা তাতে কোনো বাধা দিতেন না। তখন একদিকে যেমন পাটকাঠির প্রাচুর্য ছিল অন্যদিকে তেমনি পাটকাঠি নিয়ে বাচ্চাদের খেলাধুলা করার প্রতি সমাজ মানসের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। এখন সবকিছুরই পরিবর্তন

হয়েছে। পাটকাঠি এখন আর অপর্যাপ্ত বিষয় না; পাটকাঠি নিয়ে খেলাধুলা করার ব্যাপারেও বাচ্চারা তেমন উৎসাহী নয়। তাদের সামনে রয়েছে অনেক বিকল্প খেলার সামগ্রী।

গ্রামীণ গৃহস্থ জীবনে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হল দড়ি। সাংসারিক বিভিন্ন কাজে দড়ির দরকার হয় সবসময়। বাজারে নাইলনের দড়ি সহজলভ্য হওয়ার আগে পাটের দড়িই ছিলো মানুষের বিশেষ ভরসা। কৃষকরা সারাবছরের দড়ি পাকানোর জন্য বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়ার আগে আলাদা করে কিছু পাট রেখে দিতেন। পাট থেকে দড়ি তৈরির একটি বিশেষ পদ্ধতি হল 'বেতে কাটা'। পরিবারের বয়স্ক পুরুষরা সাধারণত এই কাজটি করতেন। মেয়েরা এই কাজ প্রায় করতেন না বললেই চলে। গ্রাম্য একটি কথা এইপ্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ্য—উক্তি 'যে ছেলে ধরবি কলসি তো বেতে কাটবি'। অর্থাৎ স্ত্রীর যদি প্রসবের সময়ে তার স্বামী যদি পায়চারি করে তবে ছেলেকে সঙ্গে নিতে হবে; আর স্ত্রী পায়চারি না করে বসে বিশ্রাম নেয় তবে বেতে কাটতে হবে। ছেলেকে ধরার বিষয়টি আজও সমানভাবে সত্য, কিন্তু বেতে কাটার দৃশ্য দ্রুত অপসৃত হচ্ছে।

একটা সময় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কৃষি সংস্কৃতির একটি পরিচিত চিত্র ছিল 'গোঁজা কুড়ানো'। জ্বালানির প্রয়োজনে গ্রামের গরিব পরিবারের বাচ্চারা মাঠ থেকে গোঁজা কুড়িয়ে আনত। মালিকপক্ষ এমনিতে গোঁজার বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখাতেন না। গরিব বাড়ির বাচ্চাদেরই গোঁজার উপর বিশেষ অধিকার ছিল। গোঁজার মরশুমে ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে মাঠে যেত এবং যত বেশি সম্ভব গোঁজা সংগ্রহ করতো। এক একটা পরিবার প্রচুর পরিমাণ গোঁজা কুড়িয়ে শুকনো করে তা সংরক্ষণ করতেন। সবচেয়ে দর্শনীয় বিষয় ছিল ছোটো ছোটো ঝুড়িতে গোঁজা সাজিয়ে তা মাথায় নিয়ে বাড়িতে ফেরা। বিষয়টি আজ আর প্রায় দেখাই যায় না।

উত্তর ২৪ পরগনার পাট সংস্কৃতির আর একটি বিশেষ অনুষঙ্গ পাটের জাগ চুরি করা। যখন পাটের বাজার মূল্য খুব বেশি ছিল তখন চোরেরা অন্যের পাটের জাগ চুরি করে ধুয়ে নিত। একেবারে পচে যাওয়া জাগ চুরি হত বেশি। নদী বা খালে জাগ দেওয়া পাট চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকত। কারণ চোরেরা জলের স্রোতে ভাসিয়ে জাগ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যেত সহজে। চুরি যাওয়ার ভয়ে কৃষকরা বাড়ির কাছাকাছি পুকুরে বা স্থির জলে পাট জাগ দিত। এখন তেমন বাজার মূল্য না থাকায় পাট চোরেরা তাদের ব্যবসায় উৎসাহ হারিয়েছে।

'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা তালিকা নং-৪০৮৪৫, বাংলা পত্রিকা তালিকা নং-৩৩

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ, ১১২ সংখ্যা

মার্চ, ২০১৯

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

এম. এস. প্রকাশন

মোহনপুর, মেদিনীপুর, ভারত।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭,
বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১২ সংখ্যা

মার্চ,২০১৯

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোঃ-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

'Ebong Mahua'--UGC Approved listed Journal,
Journal Serial No.--42327, Bengali Journal Serial No.--33

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature and Research Journal

21th Year, 112 Volume
March,2019

Published By
K. K. Prakashan
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By
K.K.Prakashan
Cover Designed By
Kohinoorkanti Bera
Midnapur

Communication :
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.
Mob.-9153177653
Email- madanmohanbera51@gmail.com /
kohinoor.bera @ gmail.com

Rs.575

সূচীপত্র

১. লোকসাহিত্য ও লোকসংগীতের শৈলী সন্ধান : শান্তনু দলাই ৯
২. রাজ্যের অমানবিক বিশ্বাস : ডাইনি : অভিজিৎ কুমার রানা ১৫
৩. সাম্প্রদায়িক বিভাজন না মানবতার আহ্বান-'ধর্মযুদ্ধ' : অতনু কর ২৪
৪. প্রসঙ্গ : গান্ধীর রাম রাজ্যের ধারণা : মানস কুমার রানা ৩০
৫. সুখবিলাসিতা বনাম কর্তব্য বোধের দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ
'কলকাতার ইলেকট্রা' : সোমা মণ্ডল ৩৪
৬. রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প : প্রসঙ্গ কৃষ্ণচাতক : উর্মিলা পতি ৪০
৭. 'আমার জীবন' : উনিশ শতকীয় নারী জীবনের
কলকাতার আধুনিক নারী কথার সূচনা : নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য ৫২
৮. শিল্পচেতনার আলোকে ভগীরথ মিশ্রের
'দুর্ভিক্ষ ও বেহালাবাদক' : নবগোপাল সামন্ত ৬২
৯. রবীন্দ্রনাথের গান : প্রসঙ্গ বৈষ্ণবতত্ত্ব : সুজিতকুমার পাল ৬৮
১০. সুভাষিণী : নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই : পুতুল দৈত্য ৭৫
১১. প্রাচীন 'যাত্রা'র অর্থ, উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশ : শোভন ঘোষ ৮৩
১২. গান্ধীজি ও দেশবন্ধু : শ্যামাপদ মাঝি ৯৯
১৩. মনসা চরিত্র : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও
নারায়ণ দেব : কার্তিক চন্দ্র অধিকারী ১০৪
১৪. শিশুসাহিত্যের সেকাল ও একাল : একটি
তুলনামূলক আলোচনা : গৌতম কর ১১৩
১৫. ইতিহাসে বিতর্ক : প্রসঙ্গ-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের
মহাবিদ্রোহ : অমিতকুমার কর ১১৭
১৬. মুর্শিদাবাদ জেলার কথ্য বাংলা ভাষায়
সুরতরঙ্গের প্রয়োগ : টুকটুকি হালদার ১২৫
১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর
মাঝি : সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ : প্রদীপ্ত দাস ১৩৩
১৮. রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারায় বিদ্রোহী
নারীর নবজাগরণ : সুরজিৎ মণ্ডল ১৪১
১৯. লালসালু : ধর্মের ভণ্ডামীতে প্রপীড়িত : রত্না রায় ১৪৭
২০. রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা : অজিত দে ১৫৬
২১. ভারত বিভাগ প্রতিক্রিয়া : একটি
সাম্প্রদায়িক পরিপ্রেক্ষিত : নিশিকান্ত মণ্ডল ১৬৬

২২. ঔপনিবেশিক বাংলার মুসলিম স্ত্রীশিক্ষা ও
বুদ্ধিজীবীদের অভিমত : মিজা বিশ্বাস ১৭০
২৩. বিভূতিভূষণের আরণ্যক : প্রকৃতি প্রেমের
অন্তরালে অরণ্য-প্রেম : শীর্ষকান্তি অধিকারী ১৭৪
২৪. আধুনিক সাহিত্যে মধ্যযুগের অতীত ও অনুষঙ্গের পুনর্নির্মাণ:
কমলকুমারের 'অন্তর্জলী চেতনা' : গোপাল মণ্ডল ১৮১
২৫. মালদহের রেশমশিল্প ও বাণিজ্য (১৭৫৭-১৮৩৩খ্রি.):
একটি অনুসন্ধান : এক সাবিরুদ্দিন ১৮৫
২৬. মেদিনীপুরের আড়তব্যবস্থার একটি
ক্ষেত্র সমীক্ষার বিবরণ : প্রসেনজিৎ নায়েক ১৮৯
২৭. রবীন্দ্রনাথের নাটকে পরিবেশ ভাবনা : মিজানুর রহমান ১৯৭
২৮. ভাষা সমীক্ষায় পাটাশপুর : লক্ষীকান্ত দাস ২০৪
২৯. পূর্বপার্বতী : তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার
ক্রমশ নাশ উপলব্ধি : সৌমেন গিরি ২১৩
৩০. মহিষাদলের কৃষক সমাজে প্রচলিত
কিছু শব্দ, শব্দার্থ : এটিএম শামসদ্দুহা ২১৯
৩১. পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের আলোকে বাস্তু-নারীবাদ: মুনিরা চৌধুরী ২২৮
৩২. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা ছোট গল্প: বিশ্বজিৎ পোদ্দার ২৩৩
৩৩. জীবনানন্দ দাশের কবিতা
বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব : সুশান্ত কুমার মণ্ডল ২৩৯
৩৪. প্রাচীন দেশজ লোকপ্রযুক্তি : তড়িৎ দাস ২৪৪
৩৫. বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা ভাবনায়
লোকায়ত দর্শন : মনিষ ভুঁইঞা ২৫০
৩৬. বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতি : কমলেশ মণ্ডল ২৫৫
৩৭. লোকউৎসব বাঁদনায় শ্রমচেতনা : অনুপ মাহাত ২৬০
৩৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'পদ্মানদীর মাঝি':
একটি মূল্যায়ন : অরূপ পাঁড়ি ২৬৪
৩৯. জলপুর : জেলে সমাজের জীবনযাপন : তরুণকান্তি মণ্ডল ২৭২
৪০. বিশ-একুশ শতকের পাহাড়িয়
গ্রামজীবন ও সংস্কৃতি : লক্ষীন্দর পালোই ২৭৬
৪১. নিসর্গচেতনার ধারায় বাংলা আধুনিক কবিতা :
বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ : নিখিলচন্দ্র মাহাতো ২৮১
৪২. প্রাক্তনের সমস্যা: নন্দিনী বোরার গল্প সূত্র : উজ্জ্বল প্রামানিক ২৮৩

৪৩. বেগমরোকেয়ার ভট্টাচার্য শক্তি চট্টোপাধ্যায় : সোমা মুখার্জি........ ২৯৩
৪৪. সমধর্মী সখা : রবীন্দ্রনাথ ও
দ্বিজেন্দ্রলাল : অভয় সিংহ মহাপাত্র.................................. ২৯৮
৪৫. এইসব অন্ধকার চিত্রকল্প : ভাস্কর গুপ্তের কবিতা : রাজা মণ্ডল.......... ৩১৩
৪৬. হ্রস্বকবিতার চেতনা - শারাভাইম গৌরগোপাল কর............... ৩২০
৪৭. আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষায়, বিজ্ঞানী
জগদীশচন্দ্র বসু : অমলেশ পাইকারা..................................৩৩৩
৪৮. বাঙালীর কমরেডদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : আবদুল্লাহ কথা........৩৩৭
৪৯. বাংলা সাহিত্যের দর্পণে বাদুড়ীতের আধিপত্য : প্রসঙ্গত
বীতশোকিন্দের উদ্ভব প্রভাব : সৌমিত্র মুখার্জী.........................৩৪৩
৫০. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে মুসলমান
লেখক : সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা : দীপঙ্কর আচার্য.............................৩৪৯
৫১. নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয় ও
রূপের পর্যালোচনা : সমীর প্রধান.. ৩৫৫
৫২. মুণ্ডা উলগুলানী বিদ্রোহ ও বীরসা মুণ্ডার
ভূমিকা : অনুপ কুমার মণ্ডল.. ৩৬৩
৫৩. সময়ের দর্পণে মহীয়সী বেগম রোকেয়া : রেহানা খাতুন........... ৩৬৭
৫৪. অর্থনীতির জননী : মাদার টেরিজা : ড. শঙ্কর প্রসাদ মাঝি.......... ৩৭১
৫৫. সফলতা-বিফলতা : ব্যক্তিজীবনে
সাফল্যমাত্রার দর্পণ : ড. প্রশান্ত বিশ্বাস.................................. ৩৭৫
৫৬. ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে-নারীবাদী আন্দোলন : ড.বিশ্বেশ চন্দ্র রায়...... ৩৯১
৫৭. বিপর্যয় ও তার প্রতিরোধ : ড.তপন কুমার সর্দার..................... ৩৯৭
৫৮. টম মরগান মডেল : নির্জন এক
কবি-সাধক : ড. শেখ মনজুরুল ইসলাম................................ ৪০০
৫৯. দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র আলোকে উত্তরবঙ্গের
ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতি : ডা. গীতা শীল............. ৪১৭
৬০. 'কবি'-র দু'টি কথা : ড. বিশ্বজিৎ পোদ্দার.............................. ৪২৯
৬১. প্রতিবিম্বমানুষের কথাসাহিত্য ও লোকসাহিত্য : শ্রীমতী পণ্ডিত......... ৪৩৮
৬২. রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের শয়নে,
স্বপনে, মননে : ড. মদনকান্তি বৈদ্য...................................... ৪৪৬
৬৩. শিবরাম চক্রবর্তীর সৃষ্টি : এক বঞ্চিত
মানুষের লেখনির শক্তধারা : ড. শর্মিষ্ঠা আচার্য........................ ৪৫০
৬৪. কবি আর কবিতার অনুভবে : মৈত্র ড. জাকিরুল গোস্বামী........... ৪৫৭

৬৫. মানব-সম্পর্কের জটিলতা— বিভূতিভূষণের
নির্বাচিত উপন্যাসে :ড. নির্মাল্য মণ্ডল........................ ৪৬১
৬৬. বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যভাবনা : ড. সন্দীপকুমার মণ্ডল........................ ৪৬৭
৬৭. গীতগোবিন্দে নৃত্য : ড.শান্তনু মণ্ডল........................ ৪৭৭
৬৮. কবি কথা : অকথিতর মোড়কে :ড. জ্যোতিপ্রকাশ মণ্ডল............ ৪৮২
৬৯. জগদীশ গুপ্তের 'রতিয়ার কাহিনী': এক
নারীর আত্মমর্যাদার সংকট :ড.তাপস রায়........................ ৪৮৯
৭০. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে
বাস্তবতা :ড.উৎপলা পাইক মণ্ডল........................ ৪৯৩
৭১. মহাভারত ও বাঙালীর কবি-মানস :ড. মধুমিতা সরকার............ ৫০০
৭২. সুন্দরবনের লোকভাষা-লোকসাহিত্য : ছড়া,
প্রবাদ, ধাঁধা : ড. কুতুবুদ্দিন মোল্লা........................ ৫০৬
৭৩. রামমোহন : একজন বড় মাপের শিক্ষক :ড. মাধব সরকার........ ৫১২
৭৪. প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতিচর্চা ও রবীন্দ্রচেতনা :ড.সুখী পাত্র............ ৫১৭
৭৫. মেদিনীপুরে প্রাপ্ত বাংলা নথিপত্রে
জাতিতত্ত্ব, বর্ণ বিভাজন ও বৃত্তি :ড. পিন্টু শীট........................ ৫২৬
৭৬. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা মানবতাবাদের
মূর্ত প্রতীক : ড.নির্মল কুমার বর্মন........................ ৫৩২
৭৭. বাংলাদেশের নওগাঁ থেকে এপার বাংলায় :
জীবন ও সময়ের দলিল : জয়গোপাল মণ্ডল........................ ৫৩৭
৭৮. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে স্বদেশ চেতনা :ড.সঞ্চিতা হালদার.......... ৫৪৪
৭৯. বাংলা উপন্যাসে জমিদার ও জমিদারিত্ব : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ এবং
তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা': ড. মনোজ মণ্ডল........................ ৫৫৭
৮০. রবীন্দ্র চিত্তপটে ত্রয়ী আধুনিক কবি : বিষ্ণু দে,
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেন : ড. তারাপদ বেরা........................ ৫৬৪

০০০লেখক পরিচিতি..৫৭১

দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রচলিত কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ

এটিএম সাহাদাতুল্লা

সারসংক্ষেপ:

শব্দ প্রয়োজনের ফসল। জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে কোনো নির্দিষ্ট ভাষাভাষি মানুষ তাদের ভাষার শব্দের স্তূপ গড়ে তোলে। শব্দ সৃজনের ক্ষেত্রে ধর্ম-সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক পেশার মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুসারে নতুন নতুন শব্দ গড়ে নেয়। তৈরী হয় তাদের নিজস্ব একটা শব্দ ভাণ্ডার। দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রচলিত গোপ, আমন, পিঁড়ি, গাড়, শাবল, পেয়ো প্রভৃতি যেমন। শব্দ মাত্রেরই আছে একটা গভীর ব্যঞ্জনা। শব্দের শরীরে মিশে থাকে ইতিহাসের হাজারো উপাদান। দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রচলিত শব্দ সমূহও তার ব্যতিক্রম না।

সূচক শব্দ: ভাষা, কৃষকসমাজ, দক্ষিণবঙ্গ, জীবিকা, ক্ষেত্রসমীক্ষা, আবহাওয়া, ঢেঁকি, পুকুর, ভোর, লাঙল, জাবড়, গোলা, বেশার, মাচান।

প্রতিপাদ্য বিষয়:

ভাষা সামাজিক মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শব্দ ভাষা রূপ সম্পদের মূল চাবিকাঠি। শব্দ সম্পদের চাবিকাঠি আবার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সূত্র ও মূল। প্রয়োজনীয়তাই শব্দের উৎস ভূমি। যখন যা কিছু প্রয়োজন হয়েছে তখন মানুষ তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এক একটি শব্দ তৈরী করে নিয়েছে। প্রয়োজনের সীমা পরিসীমা নেই। শব্দও তাই অসীম। অতুল পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে হাজারও ভাষা, এইসব ভাষার সঞ্চিত শব্দ সম্পদ অপরিমিত। সমুদ্রের জলের উপর যেমন অজস্র ঢেউ ওঠে তেমনি কোনো ভাষার শব্দ-জলধির মধ্যেও শব্দের ঢেউ ওঠে। তবে দুয়ের মধ্যে কমবেশি বিভিন্নতা আছে। জলের ঢেউ এর স্থায়ী কোনো সত্তা নেই, বিলীন হয়ে যাওয়াই এর প্রথম ও শেষ কথা। কিন্তু শব্দ মাত্রেরই একটা নিজস্ব সত্তা থাকে। কালের নিয়মে কোনো শব্দ হয়তো ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে, এক সময় হারিয়েও যায়, তবে মনে রাখতে হবে, এইভাবে হারিয়ে যাওয়া অবশ্যই সাধারণ প্রবণতা নয়। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে এক একটি ভাষায় এমনও অনেক শব্দ আছে যা প্রচলিত রয়েছে সেই প্রথম দিন থেকে। আসলে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততাই শব্দের ক্ষেত্রে মূল কথা। যতদিন প্রয়োজন থাকবে ততদিন টিকে থাকবে এক একটি শব্দ, যা হাজারও গৌরবের গোপন পরিচয় বহন করে চলেছে।

একটা সময় ছিল যখন যে কোন দেশের যে কোন ভাষারই শব্দ সম্পদ ছিল সীমাবদ্ধ। তখন জীবনের চাহিদা ছিল সামান্য। সেই সামান্য চাহিদা অনুসারেই কিছু শব্দের সঙ্গে আত্মীয়তা করলেই কাজকর্ম চলে যেত। পরে জীবনের পরিধি যত বৃদ্ধি পেয়েছে প্রয়োজনের সীমা তত প্রসারিত হয়েছে, আর এক্ষেত্রে প্রয়োজনের হাত ধরে বেশি প্রচলিত হয়েছে শব্দের স্তূপ।

উৎপাদনের পাট নিয়ে দেখা যাবে, যে কোন ভাষার শব্দ সম্পদের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষিভিত্তিক শব্দ সমূহ এবং তারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন মানুষের জীবনযাপনের জীবন ধারণের জন্য, খাদ্যোৎপাদনমূলক জীবিকার উপর নির্ভরশীল ছিল। পরে ধীরে ধীরে উৎপাদনভিত্তিক শব্দ আরও পরে কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার প্রচলন হয় ও আজও তার ধারা অব্যাহত রয়েছে। সময়ের প্রেক্ষিতে আজ হয়ত অনেক বিভিন্ন জীবিকার প্রচলন হয়েছে তবুও কৃষিকাজ তার থেকে অনুপস্থিত নয়। কৃষিকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থার এই অপরিহার্যতাই যে কোন ভাষার শব্দ ভান্ডারে কৃষিকেন্দ্রিক শব্দের উপস্থিতি রেখেছে অনন্য স্থানে। আমাদের বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই।

বাংলা শব্দভান্ডারে এমন অনেক শব্দ রয়েছে যা একান্তভাবে কৃষি কাজ বিষয়ক এবং বিশেষভাবে কৃষক সমাজে প্রচলিত। এক্ষেত্রে আলাদা করে মনে রাখার যে, এইসব শব্দ কিন্তু দেশ কাল নিরপেক্ষ নয়। কৃষক সমাজে প্রচলিত এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা সমগ্র বঙ্গদেশে জুড়ে প্রচলিত, আবার পাশাপাশি আরও কিছু শব্দ রয়েছে যা আঞ্চলিকতার বাঁধনে আবদ্ধ। হতে পারে শব্দগুলি এমন সব ক্রিয়া বা আচার বোঝায় যা বঙ্গদেশে কৃষক সমাজের সামগ্রিক নয়, আঞ্চলিক বিশেষে তার কার্যক্রিয়া, সেই হিসেবে আঞ্চলিক বিশেষে এর প্রচলন। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে ক্রিয়া বা আচারের ক্ষেত্রে সমতা রয়েছে কিন্তু ব্যবহৃত শব্দ রূপে পার্থক্য তৈরী হয়েছে। এই পার্থক্য এতটাই যে, দুটোকে এক রূপে সহজে চিনে নেওয়া যায় না। কারণটা যাই হোক না কেন এটা ঠিক যে, বঙ্গদেশে কৃষক সমাজে প্রচলিত আচারীতিতে, বিশেষত তাদের ব্যবহৃত শব্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রয়েছে। আমরা এই বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে কেবল নদীয়া মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রচলিত কিছু শব্দ ও শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরলাম-

আঁধার: জমির পাশে বড় কোন গাছপালা থাকলে সূর্যের আলো সরাসরি জমিতে এসে পড়তে পারে না, এতে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়। সূর্যের আলো ঠিকঠাক না পৌঁছানো এমন জমিকে বলা হয় আঁধার জমি।

আছাটি: অনেকদিন চাষ আবাদ না হলে জমিতে প্রচুর ঘাস জন্মায়, মাটি কিছুটা শক্ত হয়ে যায়, লাঙল চালানো সহজ হয় না, এই বিশেষ ধরনের জমিকে অনেক সময় আছাটি বলা হয়।

আঁটি: পরিমাপের একক। ধান, পাট প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক গোছা পরিমাণ ধান গাছ বা পাট গাছকে বিচুলি বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে বাঁধা হয় এবং তাকে আঁটি বলা হয়।

আলছাঁটা: দুটি পাশাপাশি চাষজমির সীমা নির্দেশক অংশকে বলা হয় আল। সাধারণ মাটি দিয়ে উঁচু এই আলে প্রচুর ঘাস জন্মায়, যা জমিতে সম্প্রসারিত হলে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। তাই নতুন ফসল লাগানোর সময় কোদাল বা দা জাতীয় অস্ত্র দিয়ে আলের ঘাস ছোট-ছোট পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। একেই বলে আলছাঁটা।

আলঠেলা: আলছাঁটার সময় কৃষকরা অনেকক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণে আলের মাটি কেটে জমিতে নামিয়ে দেয়, এতে তার জমির পরিসর কিছুটা বেড়ে যায়; এক্ষেত্রে আলের সীমানা সরে যায় অন্যের জমির দিকে। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় জমির পরিমাণ বেশ একটু বৃদ্ধি পায় আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় পার্শ্ববর্তী জমির মালিকরা। বিষয়টিকে বলা হয় আলঠেলা। কৃষক

সহজে আগাছা খুবই দূর হয়।

উড়ান দেওয়া : ধান গাছ থেকে ধানগুলিকে আলাদা করে নেওয়ার জন্য যেসব কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয় তার মধ্যে একটি হল উড়ান দেওয়া। ঝাড়ন দিয়ে ধান ঝাড়ার পরেও ধান গাছের কিছু ছোট ছোট খড় ধানের সঙ্গে মিশে থাকে, যা এমনিতে আলাদা করা খুব সহজ না। এক্ষেত্রে কুলোয় করে ধান নিয়ে হাওয়ার অনুকূলে সুকৌশলে ঐ ধান ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে ধানগুলি মাটিতে পড়ে যায় ও ধানের সঙ্গে মিশে থাকা খড়কুটোর টুকরো অংশ হাওয়ায় উড়ে যায়।

উলটানো : ধান বা ঐ জাতীয় কিছু শস্য রোদে শুকানোর সময় পা দিয়ে বার বার নেড়ে দেওয়া হয় বা উলটি-পালটি করে দেওয়া হয়, যাতে শস্য ভাল ভাবে শুকিয়ে যায়। ধান শুকানোর এই কৌশলকে উলটানো বলা হয়।

ঐকোনার : বাঁশকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী একটি শিল্প। দৈর্ঘ্য বরাবর বাঁশের মাঝে মাঝে, এক ফুট বা তারও কম অংশের ব্যবধানে এক একটি গিঁট থাকে, যেখান থেকে শাখা বা কঞ্চি বের হয়। এই গিঁট বা গিঁটকে বলা হয় ঐকো। কঞ্চিগুলিসহ এই ঐকো অংশকে সম্পূর্ণভাবে মসৃণ করাকে বলা হয় ঐকোনার।

এরোক ফের : অনেক সময় দেখা যায় লিখিত-পড়িত না করেই দুজন কৃষক পরস্পরের মধ্যে জমির অদল বদল বা বিনিময় করে। প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে তার একটা জমি চাষের জন্য দিয়ে দেয়, বিনিময়ে দ্বিতীয় জনও তার একটা জমি প্রথম জনকে দিয়ে থাকে। লেখাপড়া ছাড়াই মৌখিকভাবে জমির এই যে লেন-দেন তাকেই এরোক ফের বলা হয়।

হটোনজমা : বিশেষ এক প্রকারের জমি। অপেক্ষাকৃত অনেক উঁচু, জল সহজে জমিতে দাঁড়ায় না, মাটিও ভাল না, চাষবাস ভাল হয় না, এমন জমিকেই বলা হয় হটোনজমা।

ঢল্ হওয়া : গরুর গাড়ির অনুষঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ। গরুর গাড়ির সামনের ও পিছনের অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। না হলে যেদিকে ওজন বেশি থাকে সেই দিকটা নিচু হয়ে যায়। এই নিচু হয়ে যাওয়াকেই বলা হয় ঢল হওয়া।

নিড়ান দেওয়া : ধান চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করার পর রোপনের বেশ কয়েকদিন পর জমিতে নিড়ান প্রদান হয়। এই নিড়ান দেওয়ার একটা পর্যায় হল নিড়ান দেওয়া। নিড়ান দেওয়া পর্বে আগাছার জন্মকে যতদূর সম্ভব মাটি থেকে তুলে জমিকে বেশি করে নির্মূল করা হয়।

কাপ ধরা : কোনো কোনো বাঁশের অবস্থা সময়ে শুকিয়ে যায়। এই ধরনের বাঁশকে বলা কাপধরা। কাপ ধরা বাঁশকে দেখে বোঝা যায় মনে পড়ে।

কাদা করা : ধান রোয়ার ক্ষেত্রে জমি প্রস্তুত করার একটি পর্বকে বলা হয় কাদা করা। লাঙল দেওয়া, মই দেওয়া এসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর উপযুক্ত পরিমাণ জল সহযোগে জমিকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে রাখা হয়, যাতে ধান রোয়ার পর ছোট্ট চারা গাছ সহজে নরম মাটিতে শিকড় বিস্তার করতে পারে।

কাঠি : পাট গাছ থেকে প্রাপ্ত উপজাত দ্রব্য। পাটের অংশ ছাড়িয়ে নিলে, যার উপরে এক ফুট বা তারও বেশি লম্বা নলের মতো সরু একটা অংশ যার উপরে উঠে আসে। আসলে এই অংশটাই হল কাঠি। কাঠি সাধারণভাবে জ্বালানি (খড়ি) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কোপান : কোদাল দিয়ে মাটি কাটা বোঝাতে কোপান কথাটি ব্যবহৃত হয়।

খতির মাথা : খরচার উৎকৃষ্ট ধরনের জমিকে বলা হয় খতির মাথা। আমাদের সময় ডাকাত পুলিশ ছাড়াও খতি নামে পরিচিত। খতির খাতার মূল্য খুব বেশি। সেই সূত্রে উৎকৃষ্ট জমি হল খতির মাথা।

কুঁচি : বেতের তৈরী ছোট পাত্র। পরিমাপের একক। চাল, ধান, আটা, সরিষা ইত্যাদি পরিমাপ করার ক্ষেত্রে একটি ছোট চুবড়িসদৃশ কুঁচির অধিক ব্যবহার ছিল। এখন দাঁড়ির প্রচলন হওয়ায় কুঁচির ব্যবহার কমে এসেছে।

খোপ : লাউ, কুমড়া ইত্যাদির বীজ বপন ও চারা, বেগুন ইত্যাদির চারা রোপণ করার জন্য জমির স্থানে স্থানে একটু বেশি করে খোঁড়া হয় ও তাতে পরিমাণ মত জল দেওয়া হয়। বীজ বা চারা রোপণের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা জমির এই অংশ বিশেষই হল খোপ।

গজাল: গরুরগাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত শব্দ। গরুরগাড়ির কাঠের চাকার উপর একটি লোহার বেড় দেওয়া হয়। অনেক সময় এই বেড়টি নানা কারণে বড় হয়ে যায়। এতে গাড়ি চালানোর খুবই সমস্যা হয়। তখন কাঠের চাকা ও লোহার বেড়ের মধ্যে একটি বাঁশ বা ঐ জাতীয় কিছুর টুকরা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই বিশেষ টুকরাটিকেই গজাল বলা হয়।

গাদা: মাঠ থেকে তুলে আনা ধান গাছ থেকে যে বিচুলি বা খড় পাওয়া যায় তা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত গরুর খাদ্য হিসাবে। সারা বছরই খড় বিচুলি লাগে। এই অবস্থায় বিচুলি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না নিয়ে উপায় থাকে না। গাদা হল বিচুলি সংরক্ষণের একটি বিশেষ কৌশল।

গাঁতার কাজ: যে সব কৃষকরা নিজের মালিকানায় সামান্য জমি চাষ-আবাদ করে তারা অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে পরস্পর পরস্পরের জন্য কাজ করে দেয়, এইভাবে দলবদ্ধভাবে পরস্পরের জমিতে কাজ করাকে গাঁতার কাজ বলে।

গোড়া: পাট গাছের অংশ বিশেষ। পাট গাছ কেটে নেওয়ার পরও কিছুটা অংশ মাটির কাছে থেকে যায়, এই থেকে যাওয়া অংশগুলি জমিতে লাঙল দেওয়ার সময় মাটির উপরে উঠে আসে, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। একেই বলা হয় গোড়া।

গোড়ালে-আগালে: বাঁশের এক একটি অংশ। বাঁশের নিচের দিকের শক্ত-পোক্ত অপেক্ষাকৃত মোটা অংশকে বলা হয় গোড়ালে। আগালে হল বাঁশের ডগা বা সামনের দিকের অংশ যা তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হয়।

গোলা: গাদা যেমন বিচুলি সংরক্ষণের কৌশল, গোলা তেমনি ধান সংরক্ষণের বিশেষ কৌশল। বাঁশ,খড় ও মাটিসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গোলাকৃতির এই ধান রাখার আধার তৈরী করা হয়। প্রয়োজনানুসারে ধানের গোলার বিভিন্ন পরিমাপের হয়।

ঘোগ: ইঁদুর বা ঐ জাতীয় প্রাণীরা অনেক সময় মাঠে জমি নির্দিষ্ট যে আল থাকে তার নিচ দিয়ে গর্ত তৈরী করে সেখানে বসবাস করে। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষত বর্ষাকালে বিশেষ অসুবিধা হয়। বর্ষায় জমিতে সব সময়ই জল ধরে বা বেঁধে রাখতে হয়। আলের নিচে ইঁদুরের গর্ত থাকলে এক জমির জল অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে নেমে বা চলে যায়। এই জাতীয় গর্ত তাই কৃষকদের মাথাব্যথার কারণ হয়। তারা এই গর্তকে ঘোগ বলে।

চাবড়া: ছিটে ফোঁটা মাটি কোদাল দিয়ে বিশেষভাবে কাটা হয়। দুপাশ দুদিক থেকে কুপিয়ে তোলা হয়। এতে চিবড়াগুলির অংশ বিশেষ উঠে আসে, ফলাফলে কাজ সহজ হয়। মাটির এই অংশ অংশটিকে চাবড়া বলা হয়।

চারাটানা: পাট চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ। অনেক সময় দেখা যায় অতিবর্ষণে পাটবীজ থেকে চারা বেরোয়। এতে সমস্যা তৈরী হয়। পাটগাছ পুষ্ট বা মোটা পাট পেতে প্রয়োজন হয়। একসাথে অধিক সংখ্যক চারা তৈরী হলে কোনটিই পুষ্ট হতে পারে না। তখন কিছু চারা তুলে ফেলার দরকার হয়। একেই বলা হয় চারা টানা।

চাপান দেওয়া: ধান চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত শব্দ। ধানের ক্ষেতে ধাপে ধাপে পরিমাণ মত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। এইসব ধাপের বিশেষ একটিকে বলা হয় চাপান দেওয়া। সাধারণত ধান গাছ কিছুটা বড় হওয়ার পর গাছের আরও দ্রুত বৃদ্ধির জন্য চাপান সার দেওয়া হয়।

চেটাই বেড়া: বাঁশকে পরিমাণ মত চিরে কেটে তা থেকে বাখারি তৈরী করা এবং ঐ বাখারি দিয়ে বেড়া বোনা হয় গরু,ছাগলের অন্য কিছুর হাত থেকে ক্ষেতের ফসলকে রক্ষা করার জন্য।এই বিশেষধরণের বেড়াকে অনেকক্ষেত্রে চেটাই বেড়া বলে।

ছোলা : ছোলা কথাটি পাট চাষের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সময় পাট গাছের কোন কোনটির উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি হয় না। এতে ঐ গাছ থেকে পাটের আঁশ ঠিক মত পাওয়া যায় না। অপরিণত ঐ ধরণের পাট গাছকে বলা হয় ছোলা। ছোলা সাধারণত জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়।

জান :পুকুরের একেবারে তলদেশের বিশেষ ধরণের কাদামাটি, যাতে প্রচুর শৈবাল থাকে, তাকে জান বলা হয়। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে কোন পুকুরকে শুকিয়ে তার জান দিয়ে জমি ভরিয়ে দেওয়া হয়।

জিরেন দেওয়া : কৃষি প্রক্রিয়া বিশেষ। বহু ফসলি জমিতে সাধারণত একটির পর একটি ফসল ফলানো হয়। জমি প্রায় কোন সময়েই ফাঁকা থাকে না। এতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই অবস্থা উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কিছু দিনের জন্য এই জমিতে কোন কিছু চাষ করা হয় না, ফাঁকা ফেলে রাখা হয়। এইভাবে জমি ফেলে রাখাকে বলে জিরেন দেওয়া।

জাবনা: বিচুলি টুকরো টুকরো করে কেটে গরুকে খেতে দেওয়া হয়। এই কর্তিত বিচুলিকে জাবনা নামে চিহ্নিত করা হয়।

জাওট : জাওট, কৃষক সমাজে ব্যবহৃত বিশেষ পরিভাষা। সাধারণত যে সময় যে ফসল লাগান দেওয়া হয় বা প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ঠিক সময়েই সেই ফসল ওঠে বা লাগান দেওয়া হয় তাকে বলা হয় জাওট।

জো: না অতিরিক্ত শুকনো, না সম্পূর্ণ ভিজে, জমির বিশেষ অবস্থা। জো হলে তবেই রবি ফসলের জন্য জমিতে লাঙল দেওয়া হয়।

জোক: কোন এক কৃষি প্রক্রিয়ার প্রতিশব্দ। যে কাজ জোক দিয়ে করাতে হয় তাই কাজ বিশেষ হয় না, এমন কথাবার্তা কৃষক সমাজে প্রায়শই উচ্চারিত হয়।

জোন কাজ: কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগের বিশেষ রীতি। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়ার শর্তে এক একটি নির্দিষ্ট দিনের জন্য লোক নিয়োগ করাই হল জোন কাজ। উদাহ, কৃষি শ্রমিকদের দুটি

শ্রেণী কর্ষণ-জোন ও মেশার।

জোল: বিশেষ ধরণের জমি। জোল জমি একটু নিচু ধরনের হয়। অনেকদিন পর্যন্ত জল জমে থাকে, ধান চাষের পক্ষে এই ধরণের জমি খুবই উপযোগী।

জোড়ের মুখ: ধান চাষের ক্ষেত্রে প্রচলিত কথা। ধান গাছের সেই অবস্থা যখন ধান গাছটি দিয়ে যে কোনো দিন গাছ থেকে ধানের শিষ বের হওয়া শুরু হতে পারে।

দক্ষিণে লোক: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা কৃষিকাজের দিক থেকে সবচেয়ে অনুন্নত। বর্ষার মরসুম ব্যতীত অন্য সময় এখানে কৃষিকাজ প্রায় হয় না বললেই চলে। এতে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের নিদারুণ আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। অগত্যা বেঁচেথাকার জন্য তারা দলবদ্ধ হয়ে অন্যান্য জেলাতে কাজ করতে যায়। দক্ষিণের জেলা থেকে আগত এইসব লোকেদের বলা হত দক্ষিণে লোক।

গুড়ো বীজ-লেটো বীজ : ধান গাছের চারাকে বলে বীজ। এই বীজ দুই ধরনের হয়-গুড়ো বীজ ও লেটো বীজ। ধান থেকে বীজ তৈরীর কৌশলগত পার্থক্যের ভিত্তিতে এই শ্রেণী বিভাগ করা হয়। অল্প ভিজে মাটিতে ধান ছড়িয়ে দিয়ে যে বীজ প্রস্তুত করা হয় তা গুড়ো বীজ, আর কাদা জলযুক্ত মাটিতে ধান ছড়িয়ে দিয়ে যে বীজ প্রস্তুত করা হয় তাই হল লেটো বীজ।

নিড়েন : কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম। মূলত জমির ঘাস নিড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। লোহার তৈরী একটি বস্তু যার সামনের দিকটা চ্যাপ্টা ধরনের হয়, অবশিষ্ট অংশ গোলাকৃতির। গোলাকৃতি অংশের শেষ প্রান্তে একটি কাঠের টুকরো লাগানো থাকে, একে বলে হাতল। হাতলযুক্ত নিড়েন ঘাস নিড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। ঘাস নিড়ানো ছাড়াও মাটি থেকে ছোট ছোট জিনিস তোলার কাজে নিড়েনের ব্যবহার পাওয়া যায়।

গড় : জমিতে জলসেচ করার জন্যে ব্যবহৃত পথ। এক জমি থেকে অন্য জমিতে বা একই জমির মধ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে জল নিয়ে যাওয়ার জন্য মাটি খুঁড়ে বিশেষ প্রকারের নালা তৈরী করে নেওয়া হয়, এই নালাই হল গড়।

পাল : পাল হল ধান গাছের বিশেষ অংশ, যা ঠিক ছিঁড়িয়ে যায় না। খুঁটি যেন শক্ত-পোক্ত হয়, পাল দিয়েই বাঁধা হয়। অসমানের কাজেই পাল বেশী ব্যবহৃত হয়।

পাই-পাইদেওয়া : ধান গাছ, পাট গাছ এগুলোর পরিচর্যা করা বা কাটার সময় সম্পূর্ণ জমিটিকে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। এইসব অংশের এক একটিকে বলা হয় পাই। দলবদ্ধভাবে কাজ করার সময় কৃষি শ্রমিকরা এক একজন একেকটি করে পাই-এর দায়িত্ব নেয়। এই দায়িত্ব সম্পন্ন করাকেবলা হয় পাই দেওয়া।

পাচন : লাঙল চালানো বা গরুগাড়ি চালানোর সময় কৃষক বা চালকের হাতে বাঁশের বা কাঠের তৈরী একটা ছোট লাঠি থাকে, যা দিয়ে প্রয়োজন মত গরু গুলিকে প্রহার করা হয়। এই লাঠিটিকে বলা হয় পাচন।

পাল দেওয়া : গরুকে ধানের গাদার খাটিকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে রাখার জন্য প্রধান খুঁটি বা ঐ জাতীয় শক্ত কিছুকে খড়ির চারদিকে দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। এতে মাটির চাপ অনুযায়ী খড়ি পড়িয়া যায় না। এইভাবে খড়ির চাপের অনুকূলে প্রতিরোধ করাকে বলা হয় পাল দেওয়া।

পিলি : পিলি শব্দের ক্ষুদ্র সারবন্ধ। সাধারণত জমিতে আঁকাবাঁকাভাবে সবজি লাগানো থাকে। জলসেচ করার জন্য দুটি সারির মাঝখানে এক একটি নালা তৈরী করা হয়। এই নালার অন্য নাম পিলি।

পুলা : যে কোনভাবে জিনিসকে একত্রিত করে বাঁধলে হয় পুলা। সাধারণত খড় বিচালি করে হাত দিয়ে বা মোটা জিনিস সহযোগে এক একটি পুলা বাঁধা হয়।

পেট ভাতা : একটা সময় ছিল যখন কৃষি ক্ষেত্রে চাষাবাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশী সংখ্যক শ্রমিক কাজ করতো। এতে সামান্য পারিশ্রমিকে লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যেত। অনেক সময় এমনও হতো, কেবল একবেলা পেট ভরে খেতে দিলে একটা লোক সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হাসিমুখে কাজ করে দিত। খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করে দেওয়া এই ধরনের কৃষি শ্রমিক সম্পর্কে কথার ছিরে বলা হয়- পেট ভাতায় কাজ করে, খাটে বড় পেট ভাতার মজুর লোক পাওয়া যেত ইত্যাদি।

পোড় : মাটির তৈরী বড় পাত্র বিশেষ, যা সকল খাদ্য ও সংরক্ষণ করে। চাল, ধান, মুড়ি ইত্যাদি খাদ্য শস্য পোড়েতে রেখে নিশ্চিন্ত ভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

ফারাজ : মুসলমান কৃষক সমাজে সাধারণ ফারাজ বিশেষ প্রচলন আছে। আরবি ফারায়েজ থেকে বাংলায় ফারাজ শব্দটি এসেছে। ফারায়েজ অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তিতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও অধিকারী। তবে সাধারণভাবে মেয়েরা এই সম্পত্তি দাবী করে না। আইনের কাগজেই তা থেকে যায়। তবে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটে। মেয়েরা তাদের ভাগ বুঝে নেয় ও কখনো কখনো তা বিক্রি করে দেয়। এই প্রসঙ্গেই কথাটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়, ফারাজ বার করে নিয়েছে।

ফুরণ : কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর বিশেষ পদ্ধতি। রোজে কাজের ক্ষেত্রে দিন হিসেবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ফুরণ কাজে সম্পূর্ণ কাজটা ভাল ভাবে করে দেওয়া হবে এই শর্তে জমির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে অলিখিত চুক্তি হয়, চুক্তির শর্ত অনুসারে কাজ শেষে মালিক শ্রমিকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে।

ফুরণ পানি-ফাটাপানি : ধান চাষের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। প্রায় দুই মাস ধানী জমিতে নিয়মিত জল দিতে হয়। এই জলের জন্য অনেক সময় জমির মালিক শ্যালো মেশিন বা ডিপ ও মিনি টিউবওয়েল এর মালিকের সাথে গোটা জমিতে মরশুম ধরে জল দেওয়া হবে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়। এমনভাবে জল দেওয়া-নেওয়া কাজকে বলা হয় ফুরণপানি। ফাটা পানি হল ফুরণপানির বিপরীত প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে ঘন্টার হিসেবে পানি ক্রয় করা হয়।

ফুল ঠেকানো : আধুনিক কৃষি পদ্ধতির এক বিশেষ অধ্যায় ফুল ঠেকানো। একটা সময় ছিল যখন স্ত্রী লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ ফুলের মধ্যে পরাগ মিলন ঘটানোর জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হোত। কীট-পতঙ্গর মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পরাগমিলন ঘটত। পরে কৃষক আর এ বিষয়ে প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না থেকে নিজেরাই উদ্যোগী হয়। তারা নিজেদের উদ্যোগে পরাগ মিলন ঘটানোর চেষ্টা করে। কৃত্রিমভাবে এই পরাগমিলনের অন্য নাম ফুল ঠেকানো।

বাজরা: বাজরা হল উৎপন্ন ফসল মাঠ থেকে গাড়িতে আনা বা বাড়ি থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী বড় মাপের পাত্র। সাধারণত বাঁশের তৈরী এটা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করে বাজরা

তৈরী করা হয়।

বিয়া : বিয়া কথাটির একটি সাধারণ অর্থ আকারের সমতার মানে। তবে ধান চাষের ক্ষেত্রে বিয়া কথাটি বিশেষ অর্থ বহন করে। এখানে বাছন ছোট চারাকে বলা হয়।

বিদে দেওয়া : বিদে দেওয়া হল চারা নিড়ানোর অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। পাটের জমিতে অতিরিক্ত চারা যখন হাত দিয়ে তুলে ফেলা হয় তখন তাকে বলা হয় চারা টান। অনেক সময় হাত দিয়ে চারা না টেনে বিদে কাঠির সাহায্য নেওয়া হয়। একটি কাঠের উপর কতকগুলি লোহার পাতলা পেরেক দিয়ে তার সাহায্যে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলা হয়, একেই বলে বিদে দেওয়া। উদ্ভব, লাঙল দেওয়ার মত করে দুটি বলদ সহযোগে বিদে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে লাঙলের বদলে মানুষই বিদেকাঠি টানে।

বিল : নিচু নিচু জমি, যেখানে অনেকদিন পর্যন্ত বর্ষার জল জমে থাকে এবং যে জমিতে চাষ আমন ছাড়া হয় না।

বর্গা করা : অধিক জমির মালিক অনেক সময় জমি নিজে চাষ না করে অন্যকে চাষ করার শর্তে ভাগে দেয়। যে ভাগে চাষ করে সে কখনো কখনো জমির মালিকানার শর্ত দাবী করে এবং আইনানুগ সেই দাবী স্বীকৃত হয়। তখন চাইলেই মালিক তার জমি ফিরিয়ে নিতে পারে না। পরিবর্তে মোট উৎপাদিত ফসলের ভাগ তার দেওয়া হয় তাকে। একেই বলা হয় বর্গা করা।

ভাপানো : যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধান থেকে চাল তৈরী করা হয় তার একটি পর্বের নাম ভাপানো। ধানকে প্রাথমিকভাবে গরম জল সহযোগে ভাপ করে দু একদিন রৌদ্রে রেখে শুকিয়ে রাখা হয়। একেই বলে ভাপানো।

মাঠান : কৃষকরা তাদের জমিকে অবস্থানগত ভাবে ভাগ করে দো-মাঠান, ডাঙ্গা, শালি প্রভৃতি। যে সব জমি কেবলমাত্র চলাচলের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় মাঠান।

মেন্দার : কৃষি ক্ষেত্রে যে সব শ্রমিক কাজ করে তাদের একটি বিশেষ রূপ হল মেন্দার। সাধারণভাবে দৈনন্দিন চুক্তিতে কৃষি শ্রমিকরা কাজ করে। দিনের শেষে তাদের পারিশ্রমিক বুঝে নেয়। মেন্দার এমন দৈনন্দিন ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ নয়, মেন্দারের সঙ্গে মালিকের মাস ভিত্তিক বা তারও বেশি সময়ের জন্য চুক্তি হয়। মেন্দার মালিকের বাড়ীতেই থাকে এবং প্রয়োজনীয় সব রকম কাজ করে। মেন্দারের পারিশ্রমিক তুলনায় কম। তবে সারা বছর কাজ পাওয়ার নিশ্চিত সুযোগ থাকে তার।

রোয়া : ধান চাষের একটি পর্যায়কে বলা হয় রোয়া। বীজতোলা বা বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলে এনে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। এই রোপণ করার অন্য নাম রোয়া।

রাশনা-পাতা : ছোলা, তিল, শশা ইত্যাদি ফসলের গাছ একটা সময় উৎপাদন ক্ষমতা হারায়। তখন গাছের ঐসব অংশকে জমি থেকে তুলে নিয়ে একস্থানে জমা করে রাখে এবং পরে প্রয়োজন মত জ্বালানির কাজে ব্যবহার করে। জমি থেকে উৎপাটিত ঐসব গাছকে রাশনা পাতা বলা হয়।

হালপড়া : গরুরগাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ। গরুরগাড়ির কাঠের চাকার উপর লোহার যে বেড় লাগানো থাকে তা প্রচণ্ড গরম হয়ে বা অন্য কোন কারণে বেড়ে গেলে, কাঠের বেষ্টনী আলগা হয়ে যায়। তখন গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অবস্থাকেই বলা হয় হালপড়া বা হাল পড়ে যাওয়া।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রচলিত রয়েছে এমন হাজারও শব্দ। এইসব শব্দের অনুপুঙ্খ অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ অবহেলিত হলেও আমার এটা প্রত্যয় যে বিশেষ প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই পদক্ষেপ। শব্দ সমাজবিজ্ঞানের মহিমা। কৃষিকেন্দ্রিক শব্দ ও শব্দ বন্ধ ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে সত্য। হয়তো বহু পাঠক বিস্তৃত কৃষিকেন্দ্রিক সমাজবিজ্ঞানের অনেক কিছুর অজানা ছবি পাওয়া সম্ভব এইসূত্রে। আমাদের আশাতে দক্ষিণবঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক ভাষার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা না। অবশেষে এই রচনার প্রেক্ষিতে আগামী দিনের কোনো গবেষক দক্ষিণবঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ আলোচনায় অনুপ্রাণিত হবেন বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. অতুল সুর : বাংলার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, ১৯৯৮(৩য়), কলকাতা।

২.অশোক মুখোপাধ্যায়: সংসদ বানান অভিধান(২০০২),সংসদ ব্যাকরণ অভিধান (১৯৮৯), সংসদ সমার্থক শব্দকোষ (২০০১) সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৩.উইলিয়াম কেরী: কথোপকথন, করুণা প্রকাশনী,২০১২,কলকাতা।

৪.এম.এ.রহিম_বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,বাংলা একাডেমি, ২০০৪, ঢাকা।

৫.জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস: বাংলা ভাষার অভিধান, সাহিত্য সংসদ, ২০০৫, কলকাতা।

৬.পবিত্র সরকার : ভাষা, দেশ, কাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,১৯৯৯,কলকাতা।

৭.মুহম্মদ এনামুল হক: ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০১১, কলকাতা।

৮.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: বাংলা দেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০০৪,ঢাকা।

৯.কৃষ্ণ দাস : ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ,২০০১,ঢাকা।

১০.রবিশঙ্কর মৈত্রী:দেশি বাংলা শব্দের অভিধান,অবসর, ২০০১,ঢাকা।

১১. রাজীব হুমায়ুন: সমাজ ভাষা বিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী,২০০১,ঢাকা।

১২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬(৩য়), কলকাতা।

'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় সংবাদ পত্রিকা রেজিস্ট্রেশন নং - ৬৬,২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

৫১ তম বর্ষ, ১৪৫ সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর - ২০১৯

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.ডি. প্রেস
গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প.ব.।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)
২১ তম বর্ষ, ১১৫(ক) সংখ্যা
ডিসেম্বর,২০১৯

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal,
Journal Serial No.--96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of
Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature and Research Journal

21th Year, 115 (A) Volume

December,2019

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Midnapur

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Moh.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 600

সূচিপত্র

১.গ্রামাঞ্চলে নগরায়ণের প্রভাব (প্রসঙ্গ ঠাকুরনগর)
:: নন্দিনী হালদার..৯

২.মধ্যযুগীয় বাংলায় ইউনানি চিকিৎসা ব্যবস্থা : একটি
ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ :: গোলাম মোর্তুজা..................................১৭

৩.আধুনিক পরিবেশ চিন্তার উন্মেষ ও রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের 'বলাই' :: প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য.......................................২৫

৪.বাংলার বিজ্ঞাপনের যাত্রাপথ - একটি সংক্ষিপ্ত
পর্যালোচনা (১৯৭০-২০০০) :: দীপ গোবিন্দ চৌধুরী...................৩৩

৫.কবিতা সিংহের কবিতা : 'খাজনা' থেকে
'অমল বাবু'র নির্বাপন :: সহেলী সামন্ত..................................৪৫

৬.নবাবী বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি
:: মোসা: মেহবুবা খাতুন..৬৪

৭.সোশাল সেলফি :: গৌতম দাস..৭১

৮.রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্য কৃতির মূল্যায়ন
:: ড. সেতু চট্টোপাধ্যায়..৮৫

৯.কবিতা ও চিত্র-ভাস্কর্য :: মৃত্যুঞ্জয় পাত্রেল...............................৯৪

১০.ঢাকলের নাট্যচর্চা :: ইসরাফুল হক ১০২

১১.ভারতীয় নীতিবিদ্যায় ধর্ম ও তার মনস্তাত্ত্বিক দিক
:: ড.নির্মলেন্দু মণ্ডল..১১২

১২.মার্কসবাদী বিবেকানন্দ :: মিন্টু দাস.....................................১২১

১৩.তিতাস একটি নদীর নাম-আঞ্চলিকতা ও লোকসংস্কৃতি
:: ড. কৃষ্ণা ঘোষ...১৩৪

১৪.নারী মানবাধিকার অর্জনের ঐতিহাসিক ও
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট :: রঞ্জন কুমার দাস..............................১৪৩

১৫.তথ্য জানকরা কি, কেনো এবং তথ্যনির্ভর সমাজ
ব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা :: মহঃ রফিকুল আলম.......................১৫০

১৬.ঔপনিবেশ উত্তর পরিবেশচর্চায় কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্য
:: নন্দন বর্মণ...১৫৯

১৭.আঞ্চলিকতাবাদ এবং উপ-আঞ্চলিকতাবাদ
ভারত, BBIN ও BIMSTEC :: দেবস্মিতা নাথ গুহ....................১৭৯
১৮.১৮শ ও ১৯শ শতকের ছাপাচিত্রে কলিকাতার
সমাজচিত্রের প্রতিফলন :: শম্ভু কর্মকার....................১৮৯
১৯.সুবিমল মিশ্রের অ্যান্টি-উপন্যাস– একটি
উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠগ্রহণ :: হাবিবুর রহমান....................২০০
২০."পুরুবিক্রম" নাটকের সংলাপে স্বাভিনবত্ব
:: ড.কৃষ্ণা মুখী....................২১৪
২১.সেকালের কলকাতা ও স্বাস্থ্য : কোম্পানি আমল
থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত :: মোহন হালদার....................২২০
২২.লোকসংস্কৃতির উপাদানে সমৃদ্ধ তারাশঙ্করের ছোটগল্প
:: অনামিকা ঘোষ....................২৩১
২৩.উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যচর্চায় রেলপথের
ঐতিহাসিক গুরুত্ব :: সুদীপ্ত সরকার....................২৩৭
২৪.প্রাচীন বঙ্গের সভ্যতায় মন্দির স্থাপত্য ও তার গুরুত্ব
:: ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত....................২৪৯
২৫.অরণ্যের সরণি বেয়ে : শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধ
:: অস্মিতা মুখার্জী....................২৫৭
২৬.সংস্কৃত সাহিত্যে বিস্ময়কর জাতক কন্যা : প্রসঙ্গ
রামায়ণ, মহাভারত এবং বিক্রমোর্বশীয় :: অঞ্জলি বিশ্বাস....................২৭৩
২৭.দাদা ভাই নৌরোজির অর্থনৈতিক দর্শন বা চিন্তাধারা
:: রূপা মণ্ডল....................২৮৫
২৮.আমার জীবন-কাহিনী : রাসসুন্দরী দাশগুপ্তের
অভিমানী আত্মকথা :: অভীক দত্ত....................২৯৩
২৯.আম্বেদকর : নারী অধিকারের একজন দৃঢ় সৈনিক
:: পূর্ণিমা দাস....................২৯৯
৩০.প্রভাত ও বঙ্কিমের ধর্মীয় চেতনা প্রসঙ্গে
:: ড.অঞ্জনা মজুমদার....................৩১৩
৩১.বরাক উপত্যকার প্রথমা ঔপন্যাসিক শিহালা
শাহ : সাজন মহল:: ড.ইমদাদুর রহমান....................৩১৭
৩২.দ্রৌপদী: শোষিত, নির্যাতিত আদিবাসী
সমাজের প্রতিবাদী নারী:: দীপান্বিতা দত্ত....................৩২৪
৩৩.জীবনের বাস্তব ও বিহ্বলতা: প্রসঙ্গ 'আড়ষ্টোহ'
:: সুভাষ চন্দ্র দাস....................৩২৯

৩৪. জনার মুখ্য চরিত্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ : মহাভারত ভিত্তিক নাটকের বিশেষ উল্লেখ :: মদন মোহন কুমার ৩২৪
৩৫. কোচবিহারের লোকসঙ্গীত চর্চা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি :: আমজাদ হোসাইন ৩৪১
৩৬. মনোজ বসু উপন্যাসের পটভূমি ও ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য :: দেবজ্যোতি শীট ৩৫৭
৩৭. বাংলার টেরাকোটার চমৎকারিত্ব :: পল্লব দাস ৩৬১
৩৮. শীতকীর্ণ গীতাঞ্জলি :: নীলোৎপলা রায় ৩৭২
৩৯. মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ছন্নছাড়া' উপন্যাস : প্রান্তিকায়িত জীবনের আখ্যান :: আব্দুল জলীল চৌধুরী ৪০১
৪০. রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী : একটি অধ্যয়ন :: মধুর শাহ ৪১১
৪১. রবীন্দ্রনাথের যেতে নাহি দিব:একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন :: ড. রাখী শাহ ৪১৬
৪২. বাংলা কবিতার ভারতভাবনা :: দীপান্বিতা ঘোষ ৪২২
৪৩. অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটগল্প 'স্পর্শদোষ': এক দুর্বিষহ জীবনের ইতিবৃত্ত :: ড. মৌসুমী পাল ৪৪০
৪৪. কালিরাম মহেশ-সাঁওতালি নাটকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র :: সুনীল কুমার মাজি ৪৪৮
৪৫. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন : বাংলাদেশের রেনেসাঁস :: শেখ ইনজামাম আলম ৪৫৬
৪৬. ঔপনিবেশিক আমলে পুরুলিয়ার পরিবেশের পরিবর্তন ও আদিবাসী জনজীবনে তার প্রভাব :: নির্মল কুমার মাহাত ৪৭২
৪৭. কংসাবতী-কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রত্নস্থল সমূহের পর্যালোচনা (প্রথম-ত্রয়োদশ শতক) :: সুশান্ত মাহাত ৪৭৭
৪৮. বাঁকুড়ার হস্তশিল্পের উন্নয়নে সরকারি সহায়তা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০০০) :: সোমনাথ কর ৪৮৩
৪৯. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা সাম্যবাদী ভাবনার এক অনন্য উদ্ভাস :: মণিষা মল্লিক ৪৯৮
৫০. আত্ম-দ্বন্দ্ব-সংকীর্ণ নারীর সংসারে অবরুদ্ধ মাতৃহৃদয়: আবুল বাশারের 'চোর' গল্প :: আজাদ মণ্ডল ৫০১
৫১. [illegible] দত্ত লিখিত উমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য অনূদিত 'মাছ ও মানুষ' গল্প : পাঠ বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া :: ড. এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা ৫১০

৫২.আধ্যাত্মিকতা ও নারী: মূল্যায়নধর্মী বিশ্লেষণ :: স্বাতী ঘটক..........৫৩২
৫৩.জাতির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা : বাংলার নমশূদ্র আন্দোলন (১৮৭২ - ১৯৪৭)
:: স্বাধীন খাঁ..........৫৩৯
৫৪.বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন : বাংলাদেশের রেনেসাঁস
:: শেখ ইনতিখাব আলম..........৫৫৪
৫৫.কবি বিনয় মজুমদারের কবিতা-ভাবনা : বিনির্মাণে দেহচেতনা ও সাংকেতিক চিত্রকল্প
:: ড. অমিত বিশ্বাস..........৫৭০
৫৬.শিশু শ্রমিক: সমস্যা ও সমাধান
:: পঙ্কজ কুমার মণ্ডল..........৫৮৬
৫৭.অযোনি :-একটি রূপকথার অপমৃত্যুর গল্প
:: জুঁই নিয়োগী..........৫৯২
৫৮.পরিবেশ ও আদিবাসী সংস্কৃতি
:: শেখ মেহেবুব হোসেন..........৬০২
৫৯.দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা, মধ্যবিত্ত জীবন: প্রসঙ্গ বিমল করের 'শীতের মাঠ'
:: ড. মিঠু সেন..........৬০৭
৬০.সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ : ধর্মীয় সম্প্রীতির পাঠ
:: রবিউল আলম..........৬১২
৬১.প্রান্তিক সমাজ ও প্রান্তিক লেখকের দায়িত্ব, কর্তব্য
:: বিশ্বজিৎ দেবনাথ..........৬২৬
৬২.বাল্মীকি রামায়ণে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা
:: কাজী মাসুমা খাতুন..........৬২৯
৬৩.মানব সমাজ উন্নয়নে উদ্ভিদ এর ভূমিকা
:: ড. তমাল মণ্ডল..........৬৩৭
৬৪.কবি মদনমোহন বেরা-র 'অন্তরাল' বিনির্মিত সময়ের ইতিকথা
:: ড. সুশান্তকুমার দোলই..........৬৪০

০০লেখক পরিচিতি..........৬৪৭-৬৫০
০০০UGC-CARE list..........৬৫১-৬৫৫

মহিম বরা লিখিত উষারঞ্জন ভট্টাচার্য অনুদিত 'মাছ ও মানুষ' গল্প : পাঠ বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া

ড.এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

অসমীয়া সাহিত্যের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব মহিম বরা। ১৯২৬ সালে আসামের নগাঁও জেলার যোগসাধক চা বাগানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রাবস্থা কাটে জন্মভূমি সংলগ্ন এলাকাতেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার পর যোগ দেন অধ্যাপনার কাজে। মহিম বরা প্রায় পুরো জীবনটাই সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত করেছেন। লিখেছেন বেশ কিছু উপন্যাস, অজস্র ছোটগল্প, শিশু সাহিত্য, কবিতা ও প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর সাহিত্যকৃতি এনে দিয়েছে পদ্মশ্রী, সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারসহ অন্যান্য আরো অনেক সম্মাননা। 'হেরুয়া দিনর কথা' (১৯৭২) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। কিছু বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল 'কাথনিবাড়ির ঘাট'(১৯৬১), 'মহকুলি ত্রিভুজ' (১৯৬৭), 'এখানে নদীর মৃত্যু' (১৯৭২)।

প্রান্তিক অসমীয়া সমাজের সার্থক রূপকার মহিম বরা। আসামের গ্রাম জীবনের নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, জীবন যন্ত্রণা ও জীবন যুদ্ধের নিখুঁত ছবি গল্পকার মহিম বরা তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রান্তিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধ বিশেষভাবে ভাষা পেয়েছে মহিম বরার সাহিত্যে। গল্পের মধ্যে দিয়েও দেখিয়েছেন এইসব প্রান্তিক মানুষের জীবনবোধের ইঙ্গিত। আমাদের আলোচ্য 'মাছ ও মানুষ' গল্পটিও মহিম বরার শিল্পীচেতনার সমানুপাতিক। এখানে একদল জেলে সম্প্রদায়ের জীবনের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, তাদের সামগ্রিক সংস্কৃতি গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক চরম জীবনদর্শনের কথা বর্ণনা করেছেন। বর্তমান আলোচনায় আসামের জেলে সম্প্রদায়ের লোকসংস্কৃতিসহ তাদের জীবনবোধের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

সাহিত্য মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম বাহন। শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্য নয়, পৃথিবীর সব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। আসলে সাহিত্য বিশেষভাবে মানুষের কথা। মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা সুখ দুঃখ প্রসঙ্গ সাহিত্যের পাতায় বিশেষভাবে জায়গা করে। ফলত জীবনকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি, তাকে বাদ দিয়ে কখনোই মানুষের গল্প রচিত হতে পারেনা, যদি হয়ও তা ছিন্নমূল সৃষ্টির উদাহরণে পরিণত হয়। ভাষা, দেশ, কাল এক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে চিরকালের পটভূমিতে কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। অসমীয়া ভাষার গল্প তাই অসমীয়া সংস্কৃতির ধারক হবে এটাই স্বাভাবিক। আলোচ্য গল্পের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। একদল জেলের মাছ ধরার গল্প বর্ণনা করতে গিয়ে গল্পকার এত সুন্দরভাবে তাদের জীবনকে উপস্থাপন করেছেন যে, সেই জীবনের প্রত্যেকটা প্রসঙ্গ, তাদের কথনপদ্ধতি, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, বিশ্বাস সংস্কার সবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান লোকসমাজের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র। জেলেদের জীবিকাই হল মাছ ধরা। তাই মাছ ধরার জন্য তারা যেসব জিনিস ব্যবহার করে সেগুলো সবই তাদের সংস্কৃতির এক একটা উপাদান। আলোচ্য গল্পে আঁকড়া, পোলো, টোকা ইত্যাদি নানা লৌকিক উপাদানের নাম পাওয়া যায়। এগুলো ব্যবহার করেই জীবকাঙ্গুরা মাছ ধরে। টোকা হল বাঁশ দিয়ে তৈরি একপ্রকার আধার বা পাত্র বিশেষ, টোকায় জাল বা অন্যান্য উপায়ে ধরা মাছ সংরক্ষণ করা হয়। দড়ির সাহায্যে বেঁধে জেলেরা নিজেদের পিঠে টোকা ঝুলিয়ে রাখে। এই গল্পের জেলেরাও পিঠে টোকা বেঁধে নিয়েছে মাছ ধরার সময়—"টোকাগুলো যার যার পিঠে শক্ত করে বাঁধ।" মাছ ধরার অন্যতম উপাদান পোলো। এটি বাঁশের সরু সরু বাখারি দিয়ে তৈরি করা হয়। দেখতে অনেকটা ঢোলের মত, দুই মুখ খোলা এবং মাঝখানটা বেশ প্রশস্ত। একমুখ সরু অন্য মুখ বেশ চওড়া। পোলোর চওড়া মুখ জলের মধ্যে ডুবিয়ে মাছের উপর দিয়ে মাটিতে চেপে ধরতে হয়। তারপর উপরের সরু মুখ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাছ ধরা হয়। জুলুকি হলো মাছ ধরার আর এক যন্ত্র। এর গঠন অবিকল পোলোর মতো, কিন্তু আয়তনে অনেকটা ছোটো। ছোটো হওয়ার কারণে জেলে পরিবারের বাচ্চারা মাছ ধরার জন্য এটা ব্যবহার করে। জুলুকি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে লেখক বলছেন—"বাচ্চাদের হাতে হাতে জুলুকি।

ঝুলুকি পোলার মত ছড়ানো না, পোলের মতো উঁচুও না—খাড়া-খাড়ারে ছোট। বেশি জলে ঝুলুকিতে কাজ হবে না—কাজ্যারা থাকল তাই বিলের ধার ঘেঁষে।" আঁকড়া হল বাঁশ দিয়ে তৈরি একপ্রকার গৃহস্থালি আসবাব। বিভিন্ন সাংসারিক জিনিস ঝুলিয়ে রাখার জন্য আঁকড়া ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মাছ ধরার উপাদান বর্শা বা পচা ব্যবহারের কথা আছে এই গল্পে। বর্শা হল এক প্রকার নিক্ষেপ করার অস্ত্র। লম্বা বাঁশের ডগায় লোহার সরু সরু ফলা লাগানো থাকে। জলে না নেমেই উপর থেকে মাছের শরীর লক্ষ করে বর্শা নিক্ষেপ করা হয়। বর্শার ফলায় মাছ গেঁথে যায়। তখন বাঁশের হাতল ধরে টেনে মাছ তোলা হয়। মহুখুড়ি বিলে মাছ ধরতে যাওয়া জীবকান্তর দলের অনেকেই মাছ ধরার জন্য বর্শা ব্যবহার করেছে। গল্পকার বলেছেন—"জলে নামতে অনাগ্রহীও আছে দু-চারজন। ওরা বঁড়শির মত উলটোমুখো বর্শা বা পচা হাতে পাড় ধরে এগোতে থাকে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছোট মাছ তুলে আনবে।"

বিশ্বাস সংস্কার লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ অধ্যায়। সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যে বিশ্বাস সংস্কারের প্রভাব আছে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী সংস্কারের চেহারা বদল হতে পারে, তবে সংস্কারের প্রভাব প্রায় সবার মধ্যেই রয়েছে। 'মাছ ও মানুষ' গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় একদল জেলে মাছ ধরতে যাচ্ছে দূরের কোনো জলাশয়ে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবকান্ত। মাছ ধরতে যাওয়ার আগে জীবকান্ত তার তিন বছরের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে—'বাবাসোনা, বড় মাছ পাব?' এই প্রশ্নের উত্তরে তার স্ত্রী ছেলেকে বলতে বলে—'হ্যাঁ, বল, আজ বড় মাছ পাবে। বাবাসোনা ওর দু'হাতের বেড়ে মস্ত মাছটাকে দেখিয়ে জবাব দেয়'। এখানে লোকবিশ্বাস হলো শিশুরা কোনো কথা বললে তা বাস্তবে পরিণত হয়, বা শিশুরা যা বলে তা কখনো মিথ্যা হয় না। এই বিশ্বাস থেকেই জীবকান্ত মাছ ধরতে যাওয়ার আগে ছেলেকে প্রশ্নটি করেছিল। তার স্ত্রীও উপযুক্ত উত্তর সন্তানকে শিখিয়ে দিয়েছে। গভীর লোকবিশ্বাস এই ধরনের কথা-বার্তার মূল কারণ।

মাছ ধরা জীবকান্তর পেশা। মাছ ধরেই তার জীবিকা নির্বাহ হয়। স্ত্রী ও পুত্র রয়েছে বাড়িতে। এখনো পর্যন্ত সে কোনোদিন তার স্ত্রী-পুত্রকে খুব বড় মাছ ধরে খাওয়াতে পারেনি। এই আক্ষেপ তাকে প্রতিমুহূর্তে তাড়িত করে। তাই এবার মাছ ধরতে বেরোনোর আগে সে তিন বছরের ছেলের

মুখ দিয়ে গুরুতর কথা বার করে নিয়েছে। আসলে ছেলে তো সেই কথা বলতে পারেনি। ছেলের হয়ে জীবকান্তর স্ত্রী বলে দিয়েছে সেই মঙ্গলময় বাণী। ছেলের মুখের কথা, স্ত্রীর হাসি আর এক বুক আশা সঙ্গে করে জীবকান্ত মাছ ধরতে চলেছে।

মাছ ধরার সময় প্রথম দিকে দলের কেউ বিশেষ সাফল্য পায়নি। বেশ কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জীবকান্তর পোলোর মধ্যে এক বিশাল মাছ আটকে পড়ে। বহু কষ্টে সেই মাছের কানকোর ভেতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে মুখ দিয়ে সেই দড়ি বার করে মাছকে আটকানো হয়। কিন্তু সেই বিশালাকৃতি মাছ উল্টো টানে জীবকান্তকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে বিলের মধ্যে। চলতে থাকে মানুষ ও মাছের মধ্যে জীবনমৃত্যুর দুর্নিবার লড়াই। দানবাকৃতি মাছ যখন জীবকান্তকে টেনে নিয়ে চলেছিলো তখন অন্যান্য জেলেদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে লোক সংস্কৃতির আর এক নতুন উপাদান। এক বৃদ্ধ জেলে জীবকান্তকে উদ্দেশ্য করে বলে--

"ওরে জীব, এর আশা ছেড়ে দে। এ এলেবেলে মাছ না রে, এ বিলের দেওতা। কবে থেকে যে আছে!" দেওতা হলো অপদেবতায় ভর করা মাছ। জেলেদের বিশ্বাস এই মাছকে কেউ ধরতে পারে না বা যদি কেউ ধরার চেষ্টা করে তার অনেক ক্ষতি হয়। শুধু জীবকান্ত না এর আগেও একজনের পোলোতে পড়েছিল এই দেওতা। সেও এই মাছকে ধরতে সফল হয়নি। পরিবর্তে গভীর শারীরিক অসুস্থতায় ভুগতে ভুগতে মারা গিয়েছিল। আলোচ্য ক্ষেত্রে লেখকের বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর---

"রাতে বাড়াবাড়ি জ্বর হল, হপ্তা পেরোতে না পেরোতে মারা গেল লোকটি। প্রলাপ বকত, মাছের কথাই বলত। মাঝে মাঝেই চমকে চমকে শিউরে উঠত।" লোকবিশ্বাস মানুষকে চালনা করে। লৌকিক এই বিশ্বাস থেকেই জীবকান্তর সঙ্গীরা তাকে মাছটা ছেড়ে দিতে বলে। তারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে--"ছেড়ে দে রে জীব, ছেড়ে দে। বেঁচে থাকলে দেখিস কত মাছ পাবি।"

কোনো কঠিন লক্ষ্য পূরণ করার জন্য মানুষ অনেক সময় ধর্মের আশ্রয় নেয়। ভগবানের নামে মানতসহ আরো অনেক কিছু করে। মাছ ধরতে এসে জীবকান্ত পড়েছিল মারাত্মক এক সংকটের মধ্যে। একদিকে স্ত্রী ও পুত্রকে বড় মাছ খাওয়ানোর প্রত্যাশা, অন্যদিকে দানবাকৃতি মাছের দুর্নিবার টান। উভয়ের

মধ্যে পড়ে প্রাণ হারাতে বসা জীবকান্ত উপলব্ধি করেছিল এই মাছ ধরা তার সাধ্যের অতীত। শেষ পর্যন্ত তাই ধর্মের আশ্রয়ে সাফল্যের পথ অন্বেষণ করে সে—

"হে ভগবান যদি ধরতে পারি'—মানত করে জীবকান্ত—'থানের নামঘরে প্রদীপ চড়াব'।"

বিশ্বাস, সংস্কার, মানত সবই মানুষের দুর্বল মুহূর্তের মানসিক প্রতিক্রিয়া। মাছের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে জীবকান্ত শারীরিক ও মানসিকভাবে যখন বিপর্যস্ত, তখন সে ভগবানের কাছে মানত করতে বাধ্য হয়। এই জাতীয় মানতের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না জানা নেই, তবে লোকমানসে এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। আলোচ্য গল্পের নায়ক জীবকান্তর ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটেছে।

জীবকান্ত ও মাছের জীবন মরণ সংগ্রামের মধ্যে উঠে এসেছে অসমীয়া লোক উৎসব বিহুর প্রসঙ্গ। বিহুর পূর্ব রাতে যে আনন্দ উৎসব হয় তাকে অসমীয়া সংস্কৃতিতে উরুকা বলা হয়। উরুকার রাতে স্ত্রী পুত্রকে বড় মাছ খাওয়ানোর স্বপ্ন দেখে জীবকান্ত। খুব বড় মাছ খাওয়ার কথা দিয়ে উরুকাকে আরও বেশি করে আনন্দঘন করে তুলতে চায় সে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর একটা সময় মাছ নিস্তব্ধ হয়ে যায়, শক্তি ফুরিয়ে আসে তার। সেই নিস্তব্ধতা জীবকান্তর মনে উরুকার স্মৃতি জাগ্রত করে। সে মনে মনে বলে —

"কিন্তু মাছটা এরকম নিস্পন্দ হয়ে কী করছে, কী ভাবছে?....ওরও কি উরুকা আছে? মাছটাও কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে?"

বিপদের সেই অসম্ভব কঠিন সময়ে জীবকান্তর মনে হয়েছে মাছ একটি আস্তিক সত্তা। যার ভগবান আছে, ভগবানে বিশ্বাস আছে, স্ত্রী পুত্র আছে। তারাও অপেক্ষা করে আছে এই বিশাল মাছের জন্য।

মাছের সঙ্গে জীবকান্তর মরণ-পণ লড়াই চলতে চলতে এক সময় জীবকান্ত শরীর ও মন দুই দিক দিয়েই প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। মৃত্যুর ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে অসমীয়া পৌরাণিক ঘটনা গ্রাহ গজেন্দ্রর কাহিনি মনে পড়ে জীবকান্তর—"গজেন্দ্র শরণ লৈলা গ্রাহি হরি বুলি।" এটিও আসামের এক লৌকিক কাহিনি।

লোকজ উপাদান, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারের পাশাপাশি বহু লোকজ শব্দের ব্যবহার আছে এই গল্পে। একদল জেলে ছুটতে ছুটতে চলেছে মাছ

ধরতে। ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে ছুটছে তারা। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় লেখক যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেখানে লোকজ শব্দের ব্যবহার আছে প্রচুর। যেমন—"কখনও খুঁটিচু নাড়ার মধ্যে দিয়ে, কখনও আল ধরে ওরা এগিয়ে চলেছে।" আবার কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবকান্ত মাছ ধরতে যাওয়ার আগে খাড়িতে কাটিয়েছে কিছু মধুর মুহূর্ত। সেই সব মধুর মুহূর্তের স্মৃতি বুকে নিয়ে সে যখন তার কাজের জায়গায় যাত্রা করছে তখনও তার হৃদয়ে জেগে আছে খাড়ির স্মৃতি। আনন্দে উৎফুল্ল জীবকান্তর মনের বর্ণনা গল্পকার দিচ্ছেন—"ভোরবেলাকার রোদের মতো খুশিতে ডগমগ তার মনটা থেকে থেকে নেচে উঠছে।" এই অংশে ব্যবহৃত ডগমগ, নাড়া, আল প্রভৃতি শব্দ সর্বাংশে লৌকিক শব্দ। অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সাথে লেখক এইসব লৌকিক শব্দকে তাঁর গল্পের শরীরে ব্যবহার করেছেন এবং প্রত্যেকটা ব্যবহার বিশেষ সুন্দর হয়েছে। সব মিলিয়ে 'মাছ ও মানুষ' গল্পটি হয়ে উঠেছে অসমীয়া জেলে সমাজের লোকসংস্কৃতির এক অসামান্য দলিল। নদীর ঘেটে খাওয়া অসমীয়া মানুষজন কিভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে, জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা কোন সংস্কার মেনে চলে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, শব্দ, বাক্য, ব্যবহার্য জিনিস সবকিছু প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পে।

কোনো সন্দেহ নেই মাছ ও মানুষ গল্পটি অসমীয়া জেলে সমাজের লোকসংস্কৃতির আদর্শ দলিল। তবে শুধুমাত্র লোকসংস্কৃতির উপাদানের দলিল হিসেবেই নয়, গল্পটির প্রেক্ষিতে আছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। সমাজজীবন, ব্যক্তিজীবন, মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনযুদ্ধের পরিণাম ও তার নেপথ্য ইতিহাস অনেক সময় অন্ধকারেই থেকে যায়। যেমন অন্ধকারে থেকেছে এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবকান্তর জীবনযুদ্ধের কথা। মাছ ধরে সে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে জীবিকার অতিরিক্ত অন্য কিছু আনন্দ সে মাছ ধরার মধ্যে দিয়ে খুঁজে নিতে চায়। আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করে স্ত্রী-পুত্রকে বড় মাছ খাওয়ানোর। গল্পকার তার হৃদয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—"হে ভগবান, মুখ তুলে তাকাও। গত চার বছরে সে বউকে একটাও বড় মাছ ধরে দেখাতে পারেনি। দাঁর, বাটা, কুচি আর লোয়াজের বাচ্চা, এর বেশি না। বিশাল আকারের রুই বা কাতলা চার-পাঁচজন লোক মিলে ধরাধরি করে বয়ে এনে উঠোনে ধপাস্ করে ফেলে দেবে—গ্রামের নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ের দল এসে ঘিরে ধরবে সেই

মাছটাকে।" এবার বুক ভরা আশা আর দু-চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে সে বেরিয়েছিল মাছ ধরতে। প্রথম দিকে বিশেষ সাফল্য না পেলেও এক সময় হঠাৎ করেই তার পোলোয় আটকা পড়ে দানবাকৃতি এক বিশাল মাছ। যার লেজের ঝাপটা সহ্য করা যথেষ্ট কঠিন। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা সম্বল করে শেষ পর্যন্ত সেই মাছের কানকোর ভেতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে পোলোর কাঠির সঙ্গে মাছটিকে বাঁধতে সক্ষম হয় জীবকান্ত। কিন্তু যেকোন সময়ে মাছের লেজের ঝাপটায় জীবকান্তর শরীর বেসামাল হয়ে যায়—"জীবকান্ত এসে সবে পোলো ধরেছে, রমেদের হাত একটু আলগা হতে না হতেই মাছটা এক ঝটকায় ছিপের ফাতনার মতো পোলোটাকে সজোরে টেনে নিয়ে ছুটল বিলের মধ্য-বরাবর। জীবের একটা হাত পোলোর গলায়, অন্য হাতে জল কেটে চলেছে সে।" এরপর মাছ ও মানুষের মধ্যে চলতে থাকে চরম জীবন যুদ্ধ। জীবকান্ত স্বপ্ন দেখে এই বিশাল মাছ ধরে সে গ্রামের সবাইকে চমকে দেবে। এত বড় মাছ দেখে তার স্ত্রী পুত্রদের মুখে ফুটে উঠবে অমলিন হাসি। অন্যদিকে মাছও বাঁচতে চায়। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি কাটার চেষ্টা করে, পালানোর দুর্নিবার প্রচেষ্টায় সারা বিলময় ছুটে বেড়াতে থাকে। মাছের সঙ্গে জীবনপণ লড়াই করতে করতে জীবকান্ত দুর্বল হতে থাকে, দুর্বল হতে থাকে মাছও। একসময় জীবকান্ত জীবনের আশা প্রায় পরিত্যাগ করে—"হঠাৎ কেমন একটা নির্জনতার ভয় জেগে উঠে জীবকান্তর পায়ের তলা থেকে তালু অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। বাতাসে বিলের বুকটা যেমন করে কাঁপে, তেমনি করেই তার বুকেও একটা ভয়ের কাঁপন।" চোখের সামনে নিজের মৃত্যুকে দেখতে পেয়ে জীবকান্ত জীবনের ক্ষেত্রে গভীর এক অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়। একটা সময় তার জেলে সঙ্গীরা তাকে সাহায্য করেছিল, চেষ্টা করেছিল মাছটি তুলতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তারা জীবকান্তকে পরামর্শ দিয়েছিল মাছটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। সেই পরামর্শ জীবকান্ত গ্রহণ করেনি। এখন জীবন ও মরণের সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবকান্ত দেখতে পায় তার সঙ্গীরা কেউই তার সঙ্গে নেই। যে যার মত মাছ ধরায় ব্যস্ত, অনেকেই পাড়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে তাদের দৃশ্য দেখছে—"একবার মাথা ঘুরিয়ে এসে দেখতে পেল সঙ্গীরা সব বিলের ওধারে আবার আপনমনে মাছ ধরছে। পাড়ের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সবা তিন-চারজন, ওরই দিকে তাকিয়ে। বোধহয় রাম, বিজয় আর জয়ন্ত। কেউ কেউ কম জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে, যদি হঠাৎ করে দু-চারটে জুটে

যায়। চেঁচামেচি অনেকক্ষণ ধরেই বন্ধ—জীবকান্ত বুঝতে পারে" তার স্ত্রী পুত্রসহ ঘরে বসে বুক ভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে বিশাল মাছের স্বাদ উপভোগ করার জন্য। আর মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবকান্ত উপলব্ধি করে জীবনের যুদ্ধে পুরুষের পাশে আসতে কেউ থাকেনা। প্রত্যেকেই পুরুষের সাফল্যকে ভোগ করতে চায়, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে একবিন্দু সহযোগিতা করে না, এমনকি করতে চায়ও না। যাদের সঙ্গে সে মাছ ধরতে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই জেলে। পেশাগত সূত্রে জেলেরা সাঁতার কাটায় অত্যন্ত দক্ষ হয়। জীবকান্তর সঙ্গীরাও নেহাত কম দক্ষ ছিল না। তবুও চরম বিপদের সময় কেউ এগিয়ে আসেনি। বরং তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

জীবনের যুদ্ধে প্রত্যেককেই একা সংগ্রাম করতে হয়। এই সত্য উপলব্ধি করার পর জীবকান্তর মানসিকতা হঠাৎ করেই পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রায় অবসন্ন জীবকান্তকে একসময় সেই মাছই টেনে নিয়ে আসে বিলের পাড়ের দিকে, অল্পকাল পরে পায়ের তলায় মাটি পেয়ে জীবনের আশা ফিরে পায় সে। কিন্তু ততক্ষণে সে বুঝে নিয়েছে সংসারকে, সমাজকে আর বন্ধু হিসেবে মিশে থাকা মানুষজন আরো অনেককেই। এখন জীবকান্তর কাছে অন্য কেউ বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং যে মাছ তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে সেই মাছকেই সে পরম বন্ধু বলে মনে করে। সাফল্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ করেই মাছটির প্রতি করুণা হয় জীবকান্তর—"ছেলে-মেয়ে—গাঁয়ের লোক—আত্মীয়-কুটুম্ব—মাছের বউ-ছেলেও কি তার পথ চেয়ে বসে আছে বাবাসোনাদের মধ্যে?" এই সময় মাছকে তার পরম বন্ধু বলে মনে হয়। আসলে এটাই সত্যি। জীবকান্ত যতটা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল সেই অবস্থায় বিলের মধ্য বরাবর থাকাকালীন মাছ যদি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেত তাহলে জীবকান্তর পক্ষে সাঁতার কেটে ডাঙায় ফিরে আসা ছিল এক প্রকার অসম্ভব। মাছই তাকে টেনে নিয়ে আসে ডাঙার কাছাকাছি। ডাঙার কাছাকাছি পৌঁছানোর পর জীবকান্তর বন্ধুরা আবার তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। অর্থাৎ নিশ্চিত সাফল্য সামনে দেখতে পেয়ে সবাই তার পাশে দাঁড়াতে চায়। জীবকান্ত বুঝতে পারে বিপদে পাশে না থাকলেও, সাফল্য সবাই উপভোগ করতে চায়। জীবনের পথে এই চরম সত্য উপলব্ধি করার পর জীবকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে মাছের ভবিষ্যৎ কল্পনায়—"...কিন্তু আমরা যে পরম বন্ধু—মাছ আর আমি যে পরম বন্ধু—বিপদের বন্ধু। এদিকে ওরা এসে পৌঁছে গেল বলে—ভয়ঙ্কর গ্রাম

চলে এসেছে, আর যে সময় নেই মাছ, আর যে সময় নেই"। এরপর মরিয়া জীবকান্ত— "বুড়ো হয়ে শরীরটাকে জলে ডুবিয়ে দড়ি ধরে প্রাণপণে টেনে যাচ্ছে জীবকান্ত—গিটটা খুলতে হবে, দেখতে হবে মাছটা যাতে কষ্ট না পায়। শুশুক আরেকটু হলে লেজটা ধরে ফেলবে। সঙ্গীরা সব কাছে চলে এসেছে।" অন্তিম মুহূর্তে জীবকান্ত নিজেই মাছকে মুক্ত করে দেয়।

পরিবারপরিজন বন্ধু-বান্ধব সবাইকেই ভালোবাসে মানুষ। তবে মানুষের শেষ ভালোবাসা অবশ্যই তার নিজেকে কেন্দ্র করে। জীবনের এই চরম সত্য জীবকান্ত উপলব্ধি করেছিল। মাছকে মুক্ত করে দিয়ে সে তার অভিজ্ঞতাকে জাগ্রত করেছে। আসলে একলা পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষই নিতান্ত একা। নিজের সংকটে নিজেকেই শেষ পর্যন্ত মোকাবিলা করতে হয়। কঠিন সময়ে কেউ পাশে থাকে না। জীবনের পথে যখন প্রশ্নচিহ্ন উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবী হয়ে যায় অন্ধকার। অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে আলো জ্বালাতে হয় নিজেকেই। আলোচ্য গল্পটি এই কঠিন শিক্ষাই সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

অনুবাদ যেকোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচিত্রতার স্থান বহন করে। বাংলা সাহিত্যও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। আমরা বাংলাভাষী সাহিত্যপাঠকদের কাছে অসমীয়া ছোটগল্পের স্বাদ নেওয়া বেশ কষ্টের। অনুবাদ আমাদের সাহিত্য পাঠের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করেছে নিঃসন্দেহে। মহিম বরা রচিত এবং উষারঞ্জন ভট্টাচার্য অনূদিত 'মাছ ও মানুষ' গল্পটি বাঙালি পাঠক হৃদয়ের গভীরে জায়গা করে নেবে নিঃসন্দেহে। গল্পটির সাধারণ পরিচয়ের পাশাপাশি এর সাংস্কৃতিক ভিত্তি ও মূল্যবোধের প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। সাধারণ জেলে সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, তাদের বিশ্বাস-সংস্কার, মাছধরা সংক্রান্ত সংস্কৃতি যেভাবে এই গল্পে স্থান পেয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। আবার একইভাবে অতি সাধারণ একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পকার মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছেন তা সব দিক দিয়ে সমর্থনযোগ্য। সব মিলিয়ে 'মাছ ও মানুষ' গল্পটি গল্পকারের অসামান্য সৃষ্টি প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

তথ্যসূত্র :

- আকর গ্রন্থের উদ্ধৃতি সমূহ মুখোপাধ্যায় রামকুমার (সম্পা.), ভারতজোড়া গল্পকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, থেকে নেওয়া হয়েছে।

'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C. - CARE-List-I 2021)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত
[illegible]

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য [illegible] মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৪০ [illegible] সংখ্যা

অক্টোবর, ২০২১

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

[illegible]
[illegible] মেদিনীপুর, প.ব.।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৫০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৪০(ক) বিশেষ সংখ্যা
অক্টোবর,২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

U.G.C.- CARE List (2021) approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 86 pages placed in Page-60 & 84.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Refereed with Peer-Review Journal

23th Year, 140(A) Spl.Volume

Oct, 2021

Published By

K.K.Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 600

সূ চি প ত্র

১.দুঃখ বিষয়ে বৌদ্ধ ও সাংখ্য মতের একটি তুলনামূলক আলোচনা

:: অনুপমা বক্সী..৯

২.উত্তর-পূর্বের উপলব্ধি অন্বেষণ:একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

:: ড. অনিন্দিতা মন্ডল..১৭

৩.ইজ্জত : মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

:: ড.সরল মাহাতো ২৬

৪.ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নারী ও উন্নয়নের ধারণা

:: গায়ত্রী ভট্টাচার্য..৩৩

৫.বাংলা নাটকের মঞ্চ সজ্জার বিবর্তন :: গৌতম দাস...............৪১

৬.মনুষ্যসৃষ্ট মহামন্বন্তর :: মনোরঞ্জন জোদ্দার.......................৪৯

৭.মুর্শিদাবাদের মুসলমান সমাজে প্রান্তিক নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান :: মহিতোষ মন্ডল..... ৫৬

৮.সমকালের নিরিখে বাণী বসুর অথৈ উপন্যাসে নিঃসঙ্গতা

:: মনীষা দাস..৬৪

৯.ব্রহ্মপুত্র: নীল মাটির দেশ থেকে লাল মাটির দেশে

:: মৃণালকান্তি পাত্র...৭৩

১০.নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের সঙ্গীতচর্চা : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ :: মোসাঃ মেহবুবা খাতুন..............................৭৮

১১.পশ্চিমবঙ্গের টেরাকোটা শিল্প :: পল্লব দাস..........................৮৬

১২.ভারতীয় ভূগোলের দুর্দশা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

:: প্রদীপ কুমার পাল..৯১

১৩.উত্তর-উপনিবেশবাদ ও সমকালীন দলিত জীবন

:: প্রসেনজিৎ রায়...৯৮

১৪.স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিশিখা রূপে বাংলার ছাত্র সমাজ

:: সুনীল বিশ্বাস...১০৭

১৫.ব্রিটিশ যুগে ভারতে কারিগরি, কৃষি ও পেশাগত শিক্ষার সম্প্রসারণ : একটি বিশ্লেষণ :: বৈশালী গুহ.........................১১১

১৬.যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় বিদ্রোহ :: ড. কৃষ্ণা মুন্সী.......১১৭

১৭.শিশু শিক্ষায় 'বর্ণপরিচয়': ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

:: ড. সুস্মিতা নাথ...১২৪

১৮.উনিশ শতকে ধর্মীয় সম্প্রীতি চর্চা শিক্ষা পত্রিকার পরিক্রমা
:: আবদুল করিম...১৩১
১৯.বিজ্ঞান ভাবনার আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
:: আলাউদ্দিন মোল্লা...১৪০
২০.শম্ভু মিত্র ও বাদল সরকার: প্রসঙ্গ থিয়েটার ভাবনা
:: অমর চন্দ্র রায়...১৪৭
২১.একটি দুলালীগাছের কাহিনী : ভাঙা দেশ অথবা ভাঙা
মানুষের কাহিনী :: অমৃতা মণ্ডল...১৫০
২২.উত্তরণহীন জীবনচর্যার দ্বৈত রূপ : প্রসঙ্গ প্রেমেন্দ্র মিত্রের
'মহানগর' ও 'সাগর সঙ্গমে' :: অর্পিতা মুখার্জী......................১৫৭
২৩.সাহিত্যকে কি আত্মজীবনী কিনা বলা যায়? –
একটি সমীক্ষা :: অর্চনা মজুমদার..১৬৬
২৪.মধ্যযুগের ইসলামী প্রশাসনে মুসলমানদের ভূমিকা
:: ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত...১৭২
২৫.বাংলা কথাসাহিত্যের সেকাল-একাল :: ড. তুষার ঘোষ.........১৭৯
২৬.'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প': কল্লোলের অভিযান
:: ড. স্বপনবন্ধু রায়...১৯৪
২৭.বাংলা কবিতার প্রাণ অন্বেষণ : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
:: ড. সেতু চট্টোপাধ্যায়...২০৫
২৮.বর্ধমান জেলায় সাঁওতালি লোকগীতিতে আঞ্চলিক
বাংলা ভাষার প্রভাব :: রবিরাম মুর্মু.......................................২১৩
২৯.তর্কসংগ্রহে যথার্থবোধের একটি পর্যালোচনা :: ঈশিতা নন্দ.......২২১
৩০.সিদ্ধেশ্বরী মন্দির- একটি পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা :: জগদীশ সিং....২২৮
৩১.মঙ্গল কাব্যের প্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা দেবীর 'বেনে বউ'
এক নব আখ্যান :: অনুপম চন্দ্র বর্মন......................................২৩৬
৩২.তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগী ও নাগিনী' : বিকৃত
প্রবৃত্তির রহস্য উন্মোচন :: কনক রায় ২৪৩
৩৩.সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে আঞ্চলিক পরিবেশের স্বরূপ
:: মোঃ নূরুল আমিন..২৪৬
৩৪.চলচ্চিত্রের সংগীতের ভূমিকা – কিছু বিবর্তন ও সমস্যা
:: ড.সৌমিত্র চক্রবর্তী..২৫০
৩৫.ঔপনিবেশিক আমলে মেদিনীপুর জেলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা
ও কৃষক সমাজ :: রাজীব দোলুই...২৫৬
৩৬.নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ভারতীয় নারীর সামাজিক

আসামের অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট :: রতন কুমার দাস......২৭২
৩৭.ঔপন্যাসিক রাজশেখর ও প্রসঙ্গ :: অলোকেশ পাল..............২৮৩
৩৮.ধর্ম বনাম 'প্রতিপক্ষ' :: সুভাষ চন্দ্র দাস ২৯৩
৩৯.স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত : বুদ্ধ ও গান্ধীবাদের দ্বান্দ্বিক
প্রেক্ষাপটে লেখনী :: স্বপন কুমার সরকার....................২৯৯
৪০.প্রমথনাথ দেবের 'ডাকের আকুতি': প্রতিফলনগুলো পুনর্নির্মাণ
:: তনুশ্রী মণ্ডল..৩০৭
৪১.প্রসঙ্গ নৈতিকতা-ঈশ্বর : নীটশে ও কিয়ের্কেগার্ডের মতের
একটি পর্যালোচনা :: তিথি বাড়ুল..৩১৩
৪২.প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পরিবেশ চেতনা - একটি পর্যালোচনা
:: ড. পার্থ প্রতিম রায়..৩২০
৪৩.পাগলা দাশু:বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অমর চরিত্র
:: ড.কস্তুরি বক্সী..৩২৬
৪৪.আমার অনুভবে পঞ্চাশের কবিতা :: ড. সুশান্তকুমার গোঁসাই....৩৩১
৪৫.বাঙালির আত্মিক বিকাশ: একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ
:: প্রথম ভট্টাচার্য ৩৩৯
৪৬.কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বচিন্তনার
স্বরূপের তুলনামূলক পর্যালোচনা :: সুজনী রায় ৩৫১
৪৭.প্রসঙ্গ : সাঁওতালি ভাষা :: সুনীল কুমার মাঝি..........................৩৭৩
৪৮.অসমের লোক উৎসব :: ড. জ্যোতি সাহা ৩৮৩
৪৯.অসমের বিহু ও লোকবিশ্বাস :: প্রত্যয় সাহা..........................৩৯০
৫০.নদিয়ার পটুয়া-শিল্পীদের সেকাল ও একাল: একটি সমীক্ষা
:: সমীরণ ঘোষ..৩৯৬
৫১.বঙ্গদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা: প্রসঙ্গ
পাল ও সেন যুগ :: কুশধ্বজ মাহা......................................৪০২
৫২.আসামের চা-বাগানের মহিলা শ্রমিকদের সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে
ধারণা : একটি অধ্যয়ন :: ড. কাবেরী বরপূজারী শর্মা..........৪২১
৫৩.অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাসে পারিবারিক সম্পর্কের চালচিত্র
:: ফিরোজ আলি মণ্ডল..৪২৭
৫৪.বিদ্যাসাগর দর্শনের আলোকে জীবনানন্দ দাশের কবিতা
:: শ্রুতিপর্ণা রায়..৪৩২
৫৫.সাঁওতাল সমাজ ও সাহিত্যে মাঝি রামদাস টুডু (রেস্কা)
:: বৈদ্যনাথ হাঁসদা..৪৩৪

৫৬.বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি চেতনার পরম্পরা ও
শাহ্ গরীবুল্লাহ-র 'সত্যপীরের কথা' :: এ.এ.টি.এম সাহানাজুল.......৪৪০
৫৭.সমুদ্র গুপ্তের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি :: অজয় মণ্ডল......৪৫২
৫৮.বৌদ্ধ দর্শনে আর্যসত্য চতুষ্টয় এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ
:: ড. নির্মলেন্দু মণ্ডল..৪৫৮
৫৯.ভারতীয় সুন্দরবনের লোকসমাজে প্রচলিত ব্রত
:: ড. প্রদীপ কুমার মণ্ডল..৪৬৭
৬০.বাহারানার কথা : কাহিনি :: নারান ছাড়া..........................৪৭৬
৬১.ভারতীয় সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
:: নন্দিনী হালদার..৪৮৩
৬২.কৃষ্ণকুমারী ও অন্য নাটকের প্রজা ও শাসক প্রসঙ্গ
:: তানিয়া ইয়াসমিন মজুমদার..৪৮৯
৬৩.বিনির্মাণবাদের আলোকে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের
বিশ্লেষণাত্মক পাঠ :: ড. আবুল কাসেম মো. মানিক..............৪৯৯
৬৪.বিনির্মাণে জননী: প্রেক্ষাপট নির্বাচিত গল্পের আত্মকথন
:: নাজ বানার্জী..৫০৭
৬৫.ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে ভূমিজ সম্প্রদায়ের পূজাপার্বণ
:: অনিতা সিং..৫১৩
৬৬.মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: পুনর্পাঠ
:: মমতা চক্রবর্তী..৫১৮
৬৭.নজরুলের কবিতার প্রকরণ: বিষয় ও বৈচিত্র্য
:: আব্দুল সামাদ..৫২২
৬৮.ঐতিহাসিক অমরেশ ত্রিপাঠী ও তাঁর রচনা
:: গৌতম বিশ্বাস..৫২৯
৬৯.গোবরডাঙার দীঘি পুরাকীর্তি : এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
:: জগবন্ধু সরকার..৫৩৬
৭০.লেখক পরিচিতি..৫৪৪
৭১.UGC-CARE list..৫৪৮

বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি চেতনার পরম্পরা ও শাহ্ গরীবুল্লাহ-র 'সত্যপীরের কথা'

ড.এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। সুদূর দশম শতকে চর্যাপদ রচনার মধ্যে দিয়ে এই সাহিত্য ধারার সূচনা। অতঃপর নানা স্তর অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্য আজ সমানভাবে বয়ে চলেছে। বিস্তৃত কালপর্বের এই সাহিত্য ঐতিহ্যকে কোনো একক মাপকাঠিতে মাপা সম্ভব না। নানা সময় নানা পরিবর্তন, পরিমার্জন সমৃদ্ধ করেছে এই সাহিত্য ধারাকে। এখানে সময়ের ব্যবধানে বিষয় ও উদ্দেশ্যগত পরিবর্তনের চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট। দশম শতক থেকে ষোড়শ শতকের প্রায় শেষ পর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিষয়-ভাবনায় বৈচিত্র্যের অভাব আছে। এখানে মোটের উপর ধর্ম-চেতনারই প্রাধান্য। পরে অবশ্য দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়।

বাংলা সাহিত্য উদ্দেশ্যগতভাবে বরাবরই নানা খাতে প্রবাহিত হয়েছে। মূলত নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টাতেই এই সাহিত্য ধারার সূত্রপাত। লুই পাদ, ভুসুকু পাদ, কাহ্নু পাদ-রা নিছক সাহিত্য সাধনার জন্য চর্যাপদ রচনা করেননি। বলা যায়, তাঁদের অন্য কোনো পরিকল্পনামাফিক প্রচেষ্টা কিছুটা আকস্মিকভাবে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অতঃপর পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যা কিছু নমুনা পাওয়া যায় তার প্রায় অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক। Art for Art Sake ধারণা তখন বাঙালি সাহিত্যিকদের বিশেষ প্রভাবিত করেনি। এই সময়ের প্রধান প্রধান সাহিত্য শাখা, যেমন অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, আরাকান রাজসভার সাহিত্য সবই উদ্দেশ্যমূলক। এমনকি আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যচর্চার পিছনেও উদ্দেশ্যভাবনা বিশেষভাবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দেশ্যমুখীনতা বাংলা সাহিত্যের নেপথ্যে বিরাজ করেছে প্রথমাবধি। তবে সেখানে বৈচিত্র্য এসেছে কালে কালে।

সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে নানাবিধ লক্ষ্য প্রথমাবধি ক্রিয়াশীল থাকলেও একটি

মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির বার্তা প্রচারে বাঙালি কবিরা নিরন্তর সরব করে চলেছেন। আর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মুসলমান কবিরা। বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তাঁদেরকে প্রাণিত করেছে এ কাজে। ত্রয়োদশ শতকে বাংলার শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে তুর্কিরা। যার অনিবার্য প্রভাব পড়ে সামাজিক ক্ষেত্রে। এতদিন পর্যন্ত সমাজের পিছনের সারিতে অবস্থান করা অতি অল্প সংখ্যক মুসলমানরা রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় সহসা প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। পাশাপাশি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সার্বিক হিন্দু সমাজের সমর্থন না পেয়ে চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায়। ফলত বাংলার সমাজজীবনে ধর্মকেন্দ্রিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করে। যদিও এই অস্থিরতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পকাল পরেই সামাজিক সুস্থতার লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল হন সুফী সমাজ, সঙ্গে মুসলমান রাজন্যবর্গ। মুসলমান শাসকরা সামাজিক সুস্থতার লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজের উদ্দেশে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেন। তাঁরা হিন্দু শাস্ত্রচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে হিন্দু কবিদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার প্রভাবে নিম্নশ্রেণির বাঙালি হিন্দুরা সমাজের পিছনের সারিতে চলে যায়। কালক্রমে তাদের অবস্থা আরও করুণ হতে থাকে। লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালে অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। তুর্কি আক্রমণের পর শাসনভার মুসলমানদের দখলে আসার ফলে মুসলমান ধর্ম সংস্কৃতির প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে থাকে। ইসলাম ধর্মের উদার সাম্যবাদী নীতি জনমানসে প্রকট হয়। এতদিন পর্যন্ত যে হিন্দুরা স্বধর্মের মানুষদের দ্বারা দুঃখজনকভাবে শোষিত অত্যাচারিত হচ্ছিল তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। ফলস্বরূপ দলে দলে নিম্ন শ্রেণির শূদ্ররা মুসলমান হতে শুরু করে। ধর্মান্তরের ঢেউ এত প্রবল আকার ধারণ করে যে আতঙ্কিত হন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু হিন্দু সমাজপ্রভু। তাঁরা অনুভব করেন, ধর্মান্তরের দীর্ঘকায়া উচ্ছ্বাসকে পরিরোধ করতে হলে প্রথাবদ্ধ হিন্দু ধর্মের আপাত কিছু পরিবর্তন দরকার, দরকার সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় অধিকারের সমবণ্টন। হিন্দু সমাজ-প্রভুদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসেন সেই সময়ের মুসলমান শাসকবর্গ। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী বাংলায় উদ্ভূত সামাজিক সংকট প্রশমনে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন তুর্কি শাসকরা। তাঁরা চেয়েছিলেন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁদের শাসনে সুস্থভাবে দিনাতিপাত করুক। তাই ফলস্বরূপ হিন্দু শাস্ত্রচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে হিন্দু কবিদের মুসলমান শাসকবর্গের দ্বারা সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ। ভাগবতের অনুবাদক কবি মালাধর বসু পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন রুকনউদ্দিন বারবক শাহ'র কাছ থেকে--"মালাধর বসুর

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রুকনউদ্দিন বরবক্ শাহ্ (১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ)। কবি লিখেছেন-

"গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান।"[৩]

বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। এই সাহিত্যশাখার সূচনা হয়েছিল কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের দ্বারা। তাঁর কাব্য রচনার সার্বিক প্রেরণা দিয়েছিলেন মুসলমান রাজা- "গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। কবীন্দ্র ছিলেন তাঁর সভাকবি। পরাগল মহাভারতের কিছু কিছু কাহিনী শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং সমগ্র ভারতবৃত্তান্ত সংক্ষেপে শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সভাকবি পরমেশ্বরকে অনুরোধ করা হল মহাভারত অনুবাদের জন্য-

এই সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া।।

কবীন্দ্র সে অনুরোধ পালন করলেন।"[৪] মহাভারতের পাশাপাশি রামায়ণ অনুবাদের পিছনেও মুসলমান রাজার প্রভাব আছে। এই শাখার শ্রেষ্ঠ কবি কৃত্তিবাস খাঁ গৌড়েশ্বরের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত– মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের এই তিনটি প্রধান শাখাই মুসলমান শাসকবর্গের দ্বারা কমবেশি পুষ্ট হয়েছে। অনুবাদমূলক এইসব সৃষ্টির পিছনে কবিদের সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য নিছক ছিল না। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু লক্ষ্য পূরণের জন্যই এই প্রচেষ্টা। মুসলমান রাজারা তৎকালীন হিন্দু সমাজ-প্রভুদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এমনটা নয়। তাঁরা সচেতনভাবেই হিন্দু শাস্ত্রচর্চার মদত দিয়েছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতির প্রশ্নে তাঁদের অবস্থান এক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয়।

মুসলমান রাজাদের পাশাপাশি মুসলিম কবিরা কাব্য রচনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বার্তা প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমসাময়িক সৃষ্টি শাহ্ মোহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য সম্প্রীতির বার্তা প্রচারে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। গৌড়ের সুলতান গিয়াসু-দ-দীন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্যটি লেখা। তাঁর রাজত্বকাল অনুযায়ী অনুমান করা যায় ১৩৮৯-১৪০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। ইউসুফ জোলেখা কাব্যের বিষয় ইসলামী সংস্কৃতি প্রসূত। আল কোরানে এই কাহিনির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। সগীর মুসলিম কিংবদন্তি ও কোরানের কাহিনি কিয়দংশে গ্রহণ করে তাঁর কাব্যের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। কাব্যকাহিনিতে কবি বিভিন্নভাবে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের আয়োজন ঘটিয়েছেন। মুসলমান কবি ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, অথচ কাব্যকাহিনি শুরু করেছেন মধ্যযুগীয় হিন্দু সাংস্কৃতিক আদলে। মঙ্গল কাব্য, অনুবাদ সাহিত্যগুলিতে কাব্যারম্ভে যেভাবে দেববন্দনা আছে এই কাব্যে সেভাবে আল্লাহ, রসুলের বন্দনা আছে। মুসলমান

কবি আল্লাহ, রসুলের বন্দনা করবেন এটা স্বাভাবিক। তবে বন্দনা পদ্ধতি আমাদের অবাক করে---

"প্রথমে প্রণাম করো পরবর্দিগার।
যে আল্লা বকশিন্দা খোদা করিম হুজার।।"* পৃ.৪

আল্লাহ্ বা রসুলের উদ্দেশ্যে সালাম জানানো ইসলামী সংস্কৃতিনিষ্ঠ বিষয়। মুসলমান কবির পক্ষে আল্লার উদ্দেশ্য সালাম জানানোটা স্বাভাবিক ছিল। তা না করে কবি হিন্দু সংস্কৃতি অনুযায়ী আল্লাকে প্রণাম জানাচ্ছেন। এক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়েছেন তিনি। বাঙালি সংস্কৃতির অনুসরণের পাশাপাশি বিভিন্ন হিন্দু দেবতাদের কার্যকলাপের সম্বন্ধ বর্ণনা আছে এই কাব্যে। মুসলিম কবি সগীরের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের চূড়ান্ত উদাহরণ বিধুপ্রভার উপাখ্যান। হিন্দু রমনী বিধুপ্রভার সঙ্গে নবী পুত্র ইবন আমীনের বিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের অনবদ্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন কবি। বিধুপ্রভা ইবন আমীনের বিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি, বিবাহ পদ্ধতিতে হিন্দুরীতির সার্বিক অনুসরণের মধ্যে দিয়ে নিজের অবস্থানকে আরও জোরালোভাবে প্রকাশ করেছেন। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী সময়ে বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রের অস্থিরতা নিরসনে মুসলমান রাজাদের পাশাপাশি মুসলমান কবিরা যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম প্রমাণ সগীরের ইউসুফ জোলেখা কাব্য। সাহিত্য বিষয়ে মুসলমান কবিদের ক্রিয়াশীলতার রেশ এরপর থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকে। একের পর এক কবি এগিয়ে আসেন সাহিত্যক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে।

মোহাম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' কাব্য এই ধারার আর এক সংযোজন। কাব্যটির রচনাকাল ষোড়শ শতক। মধুমালতী কাব্যের বিষয় মুহম্মদ কবীরের মৌলিক সৃজন নয়। হিন্দি বা ফারসি ভাষায় লেখা এই রকম একটি কাহিনি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মুহম্মদ কবীর তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। মধুমালতীর মূল উপাখ্যান হিন্দু সংস্কৃতিজাত। একজন মুসলমান কবি মুসলমান রাজ দরবারে বসে হিন্দু সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। মুহম্মদ কবীরের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় এখানেও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া কাব্যকাহিনির মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের নানা ছবি কবি অঙ্কন করেছেন। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর রাজা সূর্যভান পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। রাজ পরিবারের সেই আনন্দযজ্ঞে যোগ দিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল রাজ্যবাসী-

"আলিম পণ্ডিত খাতি ছোট বড় নর।"*

'আলিম' মুসলমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের শব্দ। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানি ব্যক্তিদের আলিম বলা হয়। এরা নিজেদের ধর্ম পালনে যথেষ্ট নিষ্ঠাবান হন। এমন নিষ্ঠাবান ধার্মিক হিন্দু রাজার আনন্দ যজ্ঞে অংশ নিয়েছেন। হিন্দু রাজাও তাঁদের সাদরে বরণ করেছেন। অর্থাৎ পারস্পারিক আবেগ ও পারিপার্শ্বিক

পরিবেশ উভয়েই অনুকূল ছিল। তাই মিলন এত মধুর হতে পেরেছে। মুহম্মদ কবীরের কাব্যে আমরা উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের এমন অনেক ছবি দেখতে পাই। সেদিনের প্রত্যক্ষ সমাজবাস্তবতা এতটা মাধুর্যে ভরা ছিল কী না সন্দেহ হয়। হতে পারে রাজা সূর্যভানের মত রাজসভা বা রাজ পরিবেশের স্বপ্ন কবি দেখতেন। কামনা করতেন, এমন হোক বাংলার সাধারণ সামাজিকের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক। কাব্যকাহিনিতে সেই স্বপ্ন মায়ারই জাল বুনেছেন তিনি। মুহম্মদ কবীর ছাড়া আর পাঁচজন কবির নাম পাওয়া যায়, যাঁরা মধুমালতী উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা তাঁদের সাহিত্যের বিষয় ভাবনায় অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন সামগ্রিক ভাবে।

তুর্কি আক্রমণ বাংলার সমাজজীবনের সুস্থতা কিছুটা নষ্ট করেছিল একথা সত্য, তবে তা নিরসনে লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিলেন মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে মুসলমান কবিরা। তাঁদের এই প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি। ধীরে ধীরে বাঙালি সমাজ তার পূর্বের রূপে ফিরতে থাকে। ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কার্যকলাপ এই ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করে। মহাপ্রভুর উদার অসাম্প্রদায়িক মতবাদে আকৃষ্ট হয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালি। এইসময় অনেক মুসলমান মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চৈতন্য-শিষ্য যবন হরিদাস তারই সাক্ষ্য বহন করে।

চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন প্রেমতত্ত্ব সেদিনের বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যকে আলোড়িত করেছিল সর্বাধিক রূপে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্য চৈতন্যদেব প্রদর্শিত মানবপ্রেমের মন্ত্রে আপ্লুত। এই সময়ের বাংলা সাহিত্য চৈতন্য- সাংস্কৃতির প্রভাবে সর্বাংশে প্রভাবিত। সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ বাঙালি সাংস্কৃতির প্রভাব তখন কেবলমাত্র বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা বিস্তৃত হয় সুদূর আরাকান পর্যন্ত। আরাকান রাজসভায় বসে সৈয়দ আলাওল যখন পদ্মাবতী লিখেছেন তখনও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন বাঙালি সাংস্কৃতির দ্বারা। সেখানে মৃত রত্নসেনের দুই পুত্র চন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনের সঙ্গে সম্রাট আলাউদ্দীন বৈরিতা করেননি। বরং পিতৃহারা দুই বালকের সঙ্গে দীর্ঘ ছয় মাস চিতোরে অবস্থান করে, তাদের রাজকার্যে দক্ষ করে তুলেছেন। সম্রাট আলাউদ্দীন হিংসা ভুলে পরম অপত্যস্নেহে লালন করেছেন দুই হিন্দু বালককে। আলাওলের পদ্মাবতী মৌলিক সৃজন নয়। হিন্দি কবি মালিক মোহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যের ভাবানুবাদ এটি। জায়সীর মূল কাব্যে সম্রাট আলাউদ্দীনের সঙ্গে রত্নসেনের পুত্রদের কোনো হার্দিক সম্পর্কের চিত্র নেই। আলাওল নিজের মত করে এই কাহিনি নির্মাণ করেছেন। এক্ষেত্রে মুসলমান সুফী ধর্মের প্রেমভাবনার সঙ্গে বাঙালি সাংস্কৃতির যুগপৎ প্রভাব কবিকে চালনা করেছে বলে অনুমান করা যায়।

চিরকালীন বাঙালি সংস্কৃতি নির্মাণে মধ্য যুগের মুসলমান কবিদের অবদান ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য।

সে যাই হোক, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই যে ধর্মীয় সম্প্রীতির গভীরতা ও ব্যাপ্তি রয়েছে তাতে অনন্য সংযোজন হয়ে উঠেছে পীরসাহিত্য সমূহ; বিশেষত সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর বিষয়ক আখ্যানগুলি। ধর্মগত কলহ না, ধর্ম সংস্কৃতিগত সমন্বয়ের লক্ষ্যে যে আলাদা একটি সাহিত্য শাখার সূচনা হতে পারে তার উদাহরণ সত্যপীরকে নিয়ে রচিত সাহিত্য। বহু কবি এই ধারায় তাঁদের সৃজনী দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে যা সত্যিই বিস্ময়কর। বাংলা সাহিত্যে সত্যপীরকে নিয়ে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ষোড়শ শতকে। অতঃপর এর ধারা বহমান থাকে। এই ধারার আদি লেখক কবি কঙ্ক। তবে তিনি সত্যপীরকে নিয়ে পৃথক কোনো কাব্য রচনা করেননি। বিদ্যাসুন্দর উপাদান নিয়ে লেখা একটি কাব্যে তিনি সত্যপীরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। সত্যপীরকে নিয়ে প্রথম মৌলিক কাব্য লেখেন শেখ ফয়জুল্লাহ-"প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম কবি শেখ ফয়জুল্লাহ-ই সত্যপীরকে কাব্যের প্রধান উপজীব্যরূপে ব্যবহার করেন। এদিক থেকে এ ধারার কাব্যের পথোন্মোচনের গৌরব মূলতঃ তাঁরই প্রাপ্য।"[৮] শাহ্ গরীবুল্লাহ'র 'সত্যপীরের কথা' এই সাহিত্য ধারার একটি বিশেষ সংযোজন। কাব্যটির আনুমানিক রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

সত্যপীর হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের ধর্ম বিশ্বাসের বিশেষ ক্ষেত্র। একই ব্যক্তি হিন্দু সমাজে সত্যনারায়ণ মুসলমান সমাজে সত্যপীর নামে পূজিত হয়েছেন। সত্যপীরের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা বেশ কঠিন। তিনি হিন্দু দেবতা না মুসলমান পীর তা নিয়ে সংশয় আছে। সত্যপীর লৌকিক, পৌরাণিক না ঐতিহাসিক চরিত্র তা নিয়ে বর্তমানে- "কেউ কেউ সত্যপীরকে স্কন্দ পুরাণ এবং বহদ্ধর্ম পুরাণের রেবা খণ্ড ও উত্তর খণ্ডে উল্লিখিত সত্যনারায়ণের সঙ্গে অভিন্নতা দেখিয়ে তাঁকে পৌরাণিকীকরণের প্রয়াস পেয়েছেন।"[৯] আবার কেউ কেউ তাঁকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবেও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে কেউই এক্ষেত্রে সার্বিক সফলতা পাননি। তাই বলা যায়--"সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ মূলতঃ বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক মিলন-সেতু রচনাকারী এক কল্পিত দেবতা মাত্র।"[১০] সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ পৌরাণিক, লৌকিক বা ঐতিহাসিক যাই হোন না কেন বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে আজও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হচ্ছেন। হিন্দু সমাজে প্রতি সপ্তাহ শনি মঙ্গলবার, পূর্ণিমায় বিশেষত মাঘী পূর্ণিমা, রাস পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের পূজা হয়। এছাড়া বিভিন্ন শুভকাজে, গৃহ প্রবেশের সময়, বিপদ কাটানোর জন্য বেলপাতা, তুলসী পাতা, আঁখের গুড়, দুধ, আটা, নৈবেদ্য ধান পাঁচ রকম ফল দিয়ে সত্যনারায়ণের পূজা হয়। মুসলমান সমাজে সত্যপীরের দরগায় সিন্নি দেয়া, প্রদীপ জ্বালানো, চাদর চড়ানোর রেওয়াজ

আছে। মোটকথা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালির ধর্ম বিশ্বাসের বিশেষ ক্ষেত্র। সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের প্রাথমিক পাঠ এই বিশ্বাসের মূলে প্রথমাবধি ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে লিখিত প্রায় সব সাহিত্যে তাই সম্প্রীতির বার্তা শুনতে পাওয়া যায় বিশেষভাবে। শাহ্ গরীবুল্লাহ'র কাব্য সেই প্রথানুগ ধারার বাইরে না।

কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্ তাঁর কাব্যের পরিকল্পনাতেই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যটির নাম 'সত্যপীরের কথা'। 'পীর' শব্দটি মুসলিম সংস্কৃতি প্রসূত। ইসলামী ধর্মসাধনায় যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেন, মুসলিম সংস্কৃতিতে তাঁদের 'পীর' বলে অভিহিত বা সম্মানিত করা হয়। কাব্যনামে কবি মুসলমান সংস্কৃতিজাত শব্দ 'পীর' কথাটি ব্যবহার করেছেন। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের স্বরূপ আলোচনায় আমরা বলেছি, সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস দুই সমাজে দুই রকমভাবে প্রচলিত। তবে পূজা বা আরাধনা পদ্ধতিতে দুই সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। গরীবুল্লাহ্ কাব্যনামে সত্যপীর কথাটি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, হিন্দু সমাজে পূজ্য সত্যনারায়ণ নন, মুসলমান সমাজের সত্যপীর তাঁর উদ্দিষ্ট দেবতা। নামকরণের ক্ষেত্রে সর্বাংশে মুসলমান সংস্কৃতির দ্বারা তাড়িত হলেও এই কাব্যের প্রতিটা চরিত্রকে হিন্দু নামে, হিন্দু সংস্কৃতির অনুসারী করে অঙ্কন করেছেন। চরিত্রদের নাম শুধুমাত্র হিন্দু না, প্রায় প্রতিটা চরিত্রের নামকরণের সময় হিন্দু দেবতাদের নাম ব্যবহার করেছেন। মদন, কামদেব, সুন্দর এঁরা প্রত্যেকে হিন্দু দেবতা। কাঞ্চির প্রদেশের রাজার নাম গিরিধর। গিরিধর নামটি দেবাদিদেব মহাদেবের আর এক নাম। চরিত্র নামের পাশাপাশি কাব্য-কাহিনিও আবর্তিত হয়েছে সম্পূর্ণ হিন্দু পরিবেশে। কাব্যনাম কাব্য-পরিবেশের মধ্যে বৈপরীত্য তৈরি করে কবি তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবকে পাঠকের সামনে আরও প্রকট করার চেষ্টা করেছেন।

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ছিলেন সমাজ সচেতন সর্বাংশে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মানুষ। তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানা যায়-"গরীবুল্লাহ্ ছিলেন একাধারে কবি ও আউলিয়া। এতদঞ্চলের মুসলমানের সঙ্গে অসংখ্য হিন্দুও ছিল তাঁর ভক্ত। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদাভেদ ছিল না।"* মানুষে মানুষে সামাজিক ভেদাভেদের প্রধান জায়গা ধর্ম। ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণেই কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান হিসাবে পরিচিত। গরীবুল্লাহ্ মানুষে মানুষে এই ধর্মগত ভেদবুদ্ধিতে বিশ্বাস করতেন না। এক উদার অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কাব্যমধ্যে তাঁর এই মনোভাবের প্রকাশ আছে বিভিন্নভাবে। 'সত্যপীরের কথা' কাব্যটি রচনার নেপথ্যে কবিচিত্তে সত্যপীরের মাহাত্ম্যকীর্তন করার লক্ষ্য ক্রিয়াশীল থাকলেও কাব্যমধ্যে কখন কখন সত্যনারায়ণ কথাটি ব্যবহার করেছেন। কাব্যের নায়ক সুন্দর কাঞ্চির রাজকন্যা বিমলাকে বিয়ে করে সেই রাতেই

লুকিয়ে নিরুদ্দিশি চন্দননগরে চলে যায়। যাওয়ার আগে বিমলার শাড়ির আঁচলে লিখে যায় তার পরিচয় ও ঠিকানাসহ যাবতীয় বিবরণ। পরের দিন সকালে সেই লেখা পড়ে বিমলা বিরহবেদনায় আকুল হয়ে পড়ে। বিমলার সেই চরম দুঃখের সময় সত্যপীর শ্বেতমাছি রূপে বিমলার কাছে এসে তাকে প্রবোধ দেয়। এই জায়গায় লেখকের বর্ণনা-

"কাঁদে কন্যে শশীমুখী সঙ্গে কাঁদে সকসখী
অন্তরে জানিল সত্যপীর।
শ্বেতমাছি রূপে আসি কন্যার কাছেতে বসি
কহিলেন সত্যনারায়ণ।।"

পরপর দুটো লাইনে সত্যপীরকে দুইরকম ভাবে সম্বোধন করেছেন কবি। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ। এই দুই সম্বোধন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। কাব্যের মধ্যে আর কিছু জায়গায় একই কাজ করেছেন কবি। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্য কবিচরিত্রকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। এখানে আরও একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমলা হিন্দু ঘরের মেয়ে। আজন্ম হিন্দু পরিবেশেই তার বেড়ে ওঠা। এহেন বিমলা তার চরম বিপদের দিনে মনে মনে সত্যপীরকে স্মরণ করেছে- "অন্তরে জানিল সত্যপীর", আর মুসলমান কবি শরীফুল্লাহ্ সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন। বিমলার অন্তরের কথা আর কবির সম্বোধন; সেদিনের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সমাজের ছবি পাঠকের সামনে প্রতিভাত করে। তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পরে সামাজিক সুস্থতার লক্ষ্যে মুসলমান রাজা ও কবিদের প্রচেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয়েছিল এটি তারই প্রমাণ। আলোচ্য কাব্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সমানুপাতিক আর কিছু ছবি দেখতে পাওয়া যায়। কাব্যের একেবারে শেষপর্বে বিমলা নিজের জীবন যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করছে মদন ও কামদেব এই দুই ভাসুরের কাছে। বিয়ের আগে পর্যন্ত তার জীবন বেশ সুখেই ছিল, বিয়ে তার জীবনকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। দুই ভাসুরের কাছে জীবন যন্ত্রণার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিমলা বলছে-

"না ছুঁইনু না দেখিনু সোয়ামীর মুখ।
আমার নছিবে আল্লা দিল এত দুখ।।"

হিন্দু মেয়ে নিজের বিধাতারূপে আল্লাকে সম্বোধন করছে, বা বলা যায় ভাগ্য নির্ধারণকারী রূপে আল্লাকে স্বীকার করছে। বিধাতা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করা মুসলমান ধর্মের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ বিমলার বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর উপর তার বিশ্বাস অগাধ। খুব সহজভাবে এই বিষয়টি মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। একজন হিন্দু মেয়ে হিসাবে বিমলা যদি তার ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য ভগবানকে দায়ী করত, বা বলত ভগবান তার ভাগ্যে এত

দুঃখ লিখে রেখেছে, তবে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক হত। কবি তেমনটা না করে হিন্দু মেয়ের অন্তরে আল্লার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছেন। হয়ত কবি এমন এক সমাজেরই স্বপ্ন দেখেন যেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, আর সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ জ্ঞানে পূজা করবে। সম্প্রীতির প্রশ্নে কবির এই স্বপ্ন-সাধনা আমাদের বিস্মিত করে। অষ্টাদশ শতকে দাঁড়িয়ে একজন মুসলমান কবি সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, আবার তাঁর কাব্যের হিন্দু নায়িকা আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করছে। উদ্দেশ্য-ভাবনার ভূমিতে কবির অবস্থান কতটা দৃঢ় না হলে এমনটা সম্ভব।

আলোচনার প্রথম পর্বে আমরা বলেছি সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের নির্দিষ্ট কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে সত্যপীরকে মুসলমান পীর হিসাবে অঙ্কন করেছেন কবি। তাঁর পোশাক, কাজকর্ম সবই ইসলামী সংস্কৃতি প্রসূত। তাঁর পোশাক-

"এতেক কহিয়া পীর নারে শাথর।
হজরতি লেস্তার দিল ছেরের উপর।।"

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে মাথায় টুপিসহ আর একটি রুমাল ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে। এই রুমাল হজরতি রুমাল নামেই পরিচিত। সত্যপীর তাঁর পোশাকের অংশ হিসাবে এই রুমাল ব্যবহার করেন। সত্যপীর শুধু ইসলামী পোশাক পরেন না, ইসলামী সংস্কৃতিরও অনুসরণ করেন। মুসলমান সমাজে জমজম কূপের পানি অত্যন্ত পবিত্র পানি হিসাবে সম্মানীত। মুসলমানরা যেকোন বিপদ থেকে উদ্ধার, রোগ পরিত্রাণের লক্ষ্যে এই পানি ব্যবহার করেন। সত্যপীর সুন্দরের জীবন দান করার কাজে জমজম কূপের পানি ব্যবহার করেছেন---

"আবে জমজমার পানি দিলেন দেওয়ান।
মোরদার শরীরে সাধু পাইল জীউদান।।"

শুধুমাত্র মুসলমান হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করা নয় বা ইসলামী সংস্কৃতির সেবক হিসাবে নয়; পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে সত্যপীর যা বলেছেন তা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী ধর্ম-সংস্কৃতির সমানুপাতিক। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে, পরম শক্তিশালী আল্লাহ্ পৃথিবীসহ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে তিনি বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালনের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সেই দায়িত্ব পালন করাই প্রত্যেক মুসলমানের প্রধান কর্তব্য। ধর্মপ্রাণ মুসলমানের এই অনুভূতি সত্যপীরের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট। সত্যপীর বলছেন---

"সত্যপীর কহেন আমিন মেরা ভাই।
দেল দিয়া শোন কিছু তোমাকে বুঝাই।।
এলাহি আলামিন খাস আপনি খোদায়।

ইমান খাতিরে মুখে ফেকিল দুনিয়ায়।।"

পীরের এই কথা থেকে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের গভীরতা বোঝা যায়। এই কাব্যে সত্যপীরের যে পরিচয় তাতে তাঁকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবেই বিবেচনা করতে হয়। তবে সত্যপীর ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও সাম্প্রদায়িক নন। এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তিনি অন্তরে লালন করেন। মুসলমান হয়েও সত্যপীর তাঁর সেবক হিসাবে হিন্দু-মুসলমান সকলকে গ্রহণ করেন। যে তাঁকে অন্তর থেকে ভালোবাসে তাকেই তিনি সাহায্য করেন। সেবকের ধর্ম বিশ্বাস সেক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। কাব্য-কাহিনি থেকে আমরা জানতে পারি সত্যপীরের সেবা করলে ধন, মান থেকে সন্তানলাভ সবই সম্ভব। চন্দননগরের হিন্দু সওদাগর জয়ধর সত্যপীরের সেবা করেই পুত্র সুন্দরকে পেয়েছিল। জয়ধর মৃত্যুর পূর্বে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল আজীবন সত্যপীরের সেবা করার জন্য। জয়ধরের পুত্র মদন, কামদেব সুন্দর পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করেনি। জীবনের সব ক্ষেত্রে, সব রকম বিপদে তারা পীরকে স্মরণ করেছে এবং পীর সর্বদা তাদের বিপদভঞ্জক রূপে দেখা দিয়েছে। বিশেষত কাব্যের নায়ক সুন্দর একাধিকবার জীবন লাভসহ জীবনের অন্যান্য সবক্ষেত্রে পীরের দয়া পেয়েছে। কাঞ্চির রাজকন্যা বিমলাও ছিল পীরের সেবিকা। সেও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পীরের সাহায্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে পীর তাঁর অবস্থান জানিয়েছেন স্পষ্টভাবে-

"নিয়ত কান্দিবে যেবা আমার দরগায়।
নিশ্চয় হাসিল হবে হুকুমে খোদায়।।"

আমরা আগেই দেখেছি, সত্যপীর তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির লালনে যথেষ্ট আন্তরিক। আবার সেবকের সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর সম্মানবোধ নিতান্ত কম নয়। সুন্দরের বিয়ের সময় তাঁর সাজ পোশাকের মধ্যে পীরের এই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুন্দরকে তিনি বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছেন কাঞ্চির রাজকন্যা বিমলার সঙ্গে। এইসময় পীর তাঁর মুসলমান ফকিরি বেশ ছেড়ে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে বিমলার সয়ম্বর সভায় প্রবেশ করেছেন-

"হেন কালে সত্যপীর সুন্দরে লইয়া।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি পৌঁছিল আসিয়া।।
সর্বাঙ্গে তিলক তার কপালে জোড় ফোঁটা।
গলেতে জপন মালা মাথাভরা জটা।।"

ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্র আর পালনের ক্ষেত্র সবসময় এক হয় না; অন্তত হওয়া উচিত নয়। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এক্ষেত্রে একান্ত কর্তব্য। বিশ্বাসের ভীত যদি সঠিক থাকে, তবে সাময়িক বিপরীত আচরণে ধর্মের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং তার মধ্যে দিয়ে মানসিক উদারতা প্রকাশ পায়, অন্যদেরকে সেই উদার ভূমিতে আহ্বান করা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে সত্যপীর ঠিক

এই কাজটাই করেছেন। তিনি আচরণের মধ্যে দিয়ে সকল হিন্দু-মুসলমানকে সম্প্রীতির ভুবনে পা রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

'সত্যপীরের কথা' কাব্যের আনাচ জুড়ে কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় রয়েছে। কথা-কাহিনির ছত্রে ছত্রে কবি সম্প্রীতির ডাক দিয়েছেন। কাব্যটি পাঠ করতে করতে মনে হয়, কবি যেন স্বপ্নের রাজ্যে বিরাজ করতে করতে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। তাই তাঁর হিন্দু নায়ক সত্যপীরের সেবা করে, আর সত্যপীর ধর্মের সব বেড়াজাল ভুলে গিয়ে হিন্দু সেবকদের আপনজন হয়ে ওঠেন। কবির স্বপ্নরাজ্যের অন্তিম চিত্র বড়ই মধুর। তাঁর কাঙ্খিত সেই সমাজে ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। সত্যপীরের কথা কাব্যের আনাচ জুড়ে তিনি ক্রমাগত জাতিগত ভেদাভেদ মোচনের বার্তা দিয়েছেন। কখনও হিন্দু নায়ককে পীরের ভক্তে পরিণত করেছেন, আবার কখনও পীরকে তার সখা রূপে নির্মাণ করেছেন। সম্প্রীতির বার্তা প্রচারের প্রবল আবেগে মুসলমান পীরকে পরম সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী রূপে উপস্থাপন করেছেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সম্প্রীতি বিষয়ে কবির এত আবেগের কারণ কী? ব্যক্তিজীবনে পরম ধার্মিক একজন মানুষ, কাব্যের জগতে স্বধর্মের প্রতি আবেগ না দেখিয়ে এতটা উদার কীভাবে হলেন? উত্তরে বলতেই হয়, আদর্শ ধর্মনিষ্ঠদের কাছে মানুষই পরম সত্য। গরীবুল্লাহ্ সেই সত্য অনুধাবন করেছিলেন। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী বাংলার সামাজিক অস্থিরতা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। সমকালীন অন্যান্য আর অনেক কবিদের মত তিনি চেয়েছিলেন ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে বাঙালি মানবতার একক বন্ধনে আবদ্ধ হোক। তাই তাঁর এই প্রচেষ্টা। স্বপ্নচারী গরীবুল্লাহ্ তাই সব ভেদাভেদ ভুলে মানবতার জয়কেতন উড়িয়েছেন। একই সঙ্গে দেখিয়েছেন ধর্মের ভেদবুদ্ধি মানুষের মন থেকে সরিয়ে দিতে পারলে জীবন কতটা মধুর হতে পারে। কাব্যের একেবারে শেষ পর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জয়ধর সদাগরের ছেলেরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে মুসলমান সত্যপীরের সিন্নি দিচ্ছে। হিন্দুর দেওয়া সিন্নিতে মুসলমান মোল্লা এসে অংশ নিচ্ছে, আর হিন্দু ব্রাহ্মণ সামাজিক শ্রেণিভেদ ভুলে সকল মানুষের মধ্যে সেই সিন্নি বিতরণ করছে—

"সিরণি বাটিয়া দিল হিন্দু ব্রাহ্মণে।
পাইয়া সিরণি ঘরে গেল জনে।।

মদন কামদেবের দেওয়া সিন্নিকে আশ্রয় করে হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। শাহ্ গরীবুল্লাহ্ এইরকম সমাজের স্বপ্ন দেখেন, কাব্যমধ্যে স্বপ্নের জাল রচনা করে পাঠককে তাতে ধরা দেওয়ার আহ্বান জানান।'সত্যপীরের কথা' কাব্যটি তাঁর সেই অনবদ্য প্রচেষ্টার অনন্য উদ্ভাসন।

গ্রন্থঋণ :

আকর গ্রন্থ :

মুহম্মদ আবদুল জলিল (সম্পা.), সত্যপীরের কথা- শাহ্ গরীবুল্লাহ, শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, হাওড়া, ১৯৯১

তথ্যসূত্র :

১. গুপ্ত ক্ষেত্র, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, পৃ ৬৩
২. তদেব, পৃ ৬৬
৩. হক, এনামুল (সম্পা.), শাহ্ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ১১৩
৪. আহমদ শরীফ (সম্পা.), মধুমালতী-মুহম্মদ কবীর, সূচিপত্র, ঢাকা, পৃ ৪
৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল (সম্পা.), সত্যপীরের কথা- শাহ্ গরীবুল্লাহ, শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, হাওড়া, ১৯৯১, পৃ ১৬
৬. মুহম্মদ আবদুল জলিল (সম্পা.), সত্যপীরের কথা- শাহ্ গরীবুল্লাহ, শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, হাওড়া, ১৯৯১, পৃ ১৬
৭. মুহম্মদ আবদুল জলিল (সম্পা.), সত্যপীরের কথা- শাহ্ গরীবুল্লাহ, শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, হাওড়া, ১৯৯১, পৃ ১৯
৮. মুহম্মদ আবদুল জলিল (সম্পা.), সত্যপীরের কথা- শাহ্ গরীবুল্লাহ, শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, হাওড়া, ১৯৯১, পৃ ২০

UGC CARE LIST I_2021 (Arts and Humanities)

43.	Chetana Manasa Patrika (print only)	Chetana Publications	2455-8113	NA
44.	CLIO An Annual Interdisciplinary Journal of History (print only)	Corpus Research Institute	0976-075X	NA
45.	Cognitextes	Association Française de Linguistique Cognitive	NA	1958-5322
46.	Comparative Philosophy	Center for Comparative Philosophy, San José State University	NA	2151-6014
47.	Critic: Journal of the Centre of Russian Studies	Centre of Russian Studies, School of Language, Literature & Culture Studies, Jawaharlal Nehru Univ	2229-7146	NA
48.	Dance Education in Practice	Taylor and Francis	2373-4833	2373-4841
49.	Darsaniki (print only)	Department of Philosophy, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith	2230-7435	NA
50.	Darshnik Traimasik	[illegible]	0974-8849	NA
51.	Dastak (print only)	Department of Urdu, Faculty of Arts, Banaras Hindu University	NA	NA
52.	Dastavej (print only)	Central Institute of Hindi	2348-7763	NA
53.	Dharmadoot	Maha Bodhi Society of India	2343-3428	NA
54.	Dhimahi (print only)	Chinmaya International Foundation Shodha Sansthan	0976-3066	NA
55.	Dibrugarh University Journal of English Studies	Department of English, Dibrugarh University	0975-5659	2581-7833
56.	Dirasat Arabia (print only)	Centre of Arabic and African Studies, Jawaharlal Nehru University	2348-2613	NA
57.	Discours	Université de Paris-Sorbonne	NA	1963-1723
58.	Drishti: The Sight	Drishti: The Sight	2319-8281	NA
59.	Drishtikon (print only)	Drishtikon Prakashan	0975-119X	NA
60.	Ebong Mahua (print only)	K. K. Prakashan	NA	NA
61.	Ebong Mushayera (print only)	Ebong Mushayera	0976-9307	NA

'এবং মহুয়া' বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের (UGC CARE Listed 2021)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০১৭ সাল থেকে প্রকাশিত
১৯ পৃ. তালিকার (২০২১ ইং সাল) ৩ পৃ. ৩৭ নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

[illegible]

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

কে. কে. প্রকাশন
গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প. বঙ্গ।

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ(UGC-CARE list-I 2021)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার(৩১১টির মধ্যে) ৩ পৃ.৩০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৪১ (বিশেষ) সংখ্যা

নভেম্বর,২০২১

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

U.G.C.- CARE List-I 2021 approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 16 pages placed in Page 3 & No.60 out of 319

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Refereed with Peer-Review Journal

23th Year, 141 (Special) Volume

Nov, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-915317653

Email- madanmohanbera51@gmail.com / kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

সূ চি প ত্র

১.অন্নদায় বর্ণিত শাক্তবৈষ্ণবতত্ত্ব :: ড. অমিত কুমার সাহা..........৯

২.দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'
শিশুমনের রূপকথা :: তপন কুমার বিশ্বাস..........................১৩

৩.প্রতিমা চক্রবর্তীর 'ঘরের পাখা' গল্পে মানসিক
দাম্পত্যের করুণ চিত্র :: আজাদ মণ্ডল..........................৩০

৪.অর্থশাস্ত্র অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার সপ্তাঙ্গের তত্ত্ব বিশ্লেষণ
:: লোকেশ মণ্ডল..৪০

৫.শিক্ষার বিপুলতা ও রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার গ্রহণ-বর্জন
:: বিশ্বজিৎ সরকার..৫১

৬.পুনঃপাঠের আলোয় রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'' :: ড.মহেন্দ্র বিশ্বাস....৬১

৭.আধুনিক বাংলাকবিতার রূপরেখা ও স্বরূপ :: ড.অসিত বিশ্বাস.....৮৬

৮.রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও পরিবেশ দর্শন:: বিষ্ণু পদ সরকার..........১০১

৯.বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' : পাঠকের চোখে :: ড.নির্মল দাস..........১১৮

১০.অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' : বিষয় ও শিল্পরূপ :: অমরচন্দ্র রায় ১৩১

১১.রবীন্দ্র ছোটগল্পে দুই নারী, দ্বন্দ্ব ও তত্ত্বে :: অমরেশ মিত্র.......১৪৩

১২.মহাভারতের অনালোকিত নায়কেরা : বীরেন্দ্র কুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে :: রত্না রায়..........................১৫৫

১৩.'সবুজ পত্র' পর্বের রবীন্দ্র-ছোটগল্প: শিল্প সম্ভাবনার অন্বেষণ
:: বিপ্লব চক্রবর্তী..১৬১

১৪.শিক্ষার মানব অস্তিত্বের মূল মন্ত্র - অস্তিত্ববাদী দর্শনের দৃষ্টিতে
:: অর্পিতা সিনহা..১৬৬

১৫.প্রাচীন ভারতে শিক্ষার প্রকৃতি :: স্বপন দাস..........................১৭৭

১৬.মৈমনসিংহ গীতিকা: ক্রিয়া প্রয়োগের বৈচিত্র্য
:: প্রণবেশ ঘোষ..১৯১

১৭.চিত্ত ও চেতনায় ছন্দ এর উপযোগিতা :: ড. তমাল মণ্ডল......২০৮

১৮.সাহিত্য ও চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ :: মৃণালকান্তি গায়েন..............২২২

১৯.অন্য 'মা' :: স্বাতী পাঠক..২২৮

২০.আদি মধ্যযুগে শিলাবতী নদী তীরবর্তী অঞ্চল: বাঁকুড়া
জেলার আলোকে একটি পর্যালোচনা :: সুশান্ত মাহাতো..............২৫০

২১.১৮৬৪ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাকৃতিক

বিপর্যয়: ঔপনিবেশিকতাবাদের আলোকে একটি পর্যালোচনা
:: অভিষেক মান্না..........২৩২
২২.নিজোগ্রামে বাঁশের পুষ্পালঙ্কারমণ্ডিত মূর্তি
:: নির্মল কুমার মাহাত..........২৪২
২৩.তালাক ও মুসলিম সমাজ :: শেখ আহসান করিম..........২৪৭
২৪.দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামীয় মানবিকতা : প্রসঙ্গ দরগা সংস্কৃতি :: ড. বিশ্বরূপ সাহা..........২৫৩
২৫.ভুটান থেকে বহিষ্কৃত নেপালিদের প্রেক্ষিতে ইন্দো-নেপাল- ভুটান সম্পর্ক :: স্বাতীন খাঁ..........২৬৪
২৬.বাংলা কথাসাহিত্যে মন্বন্তর: আলোচনায় চার কাশেম উপন্যাস :: উৎকলিকা সাহা..........২৭২
২৭.কপিলের সিংহল যাত্রা : পুরাণের নবরূপায়ণ
:: ড. বরুণ মণ্ডল..........২৮৪
২৮.স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে কালিম্পং জেলায় রাজা ও রাজশাসন :: সুপ্রীতি সাহা..........২৮৯
২৯.লৌকিক জীবনের ছায়াছবি : সুন্দর বনের ব-দ্বীপ
:: দেবজ্যোতি শীট..........২৯৭
৩০.বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর অবস্থান একটি পর্যালোচনা :: ড. হারেন রায়..........৩১০
৩১.বৈদিক যজ্ঞমণ্ডে নারী :: ড. বিপুল চন্দ্র দেবনাথ..........৩১৮
৩২.কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত গোপন-সাংকেতিক ভাষা : সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ
:: ড. এ.টি.এম. সাইফুল্লাহ..........৩২৬
৩৩.তাসের রূপকসমূহে চিত্রিত নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
:: ড. অমল পারভীন..........৩৩৬
৩৪.কৃষ্ণবর্ণ পরিচয় ও অভিজ্ঞতা: আমাদন মোহাম্মদের অভিনয় কবিতায় একটি আহ্বান :: ডা. মো: হুমায়ুন এস.কে..........৩৪৩
৩৫.মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ': জমিদারের অত্যাচার ও নির্যাতনের দর্পণ :: কনক রায়..........৩৫১
৩৬.'চন্দ্রাশোক' থেকে 'ধর্মাশোক' : এক অনন্য উত্তরণ
:: মৃণাল চন্দ্র দাস..........৩৫৭
৩৭.বেগম রোকেয়া: বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানের বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র
:: সাহিনা আখতার..........৩৬৬

৩৮.ভারতের স্বাধীনতা : হরিশ্চন্দ্রপুরের অবদান
:: ড. সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়..৩৭৩
৩৯.সমবায়ভিত্তিক পল্লী-উন্নয়নের অর্থনীতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান
:: ড. তুলিকা কর..৩৭৯
৪০.বাল্মীকির রামায়ণের দৃষ্টিকোণে বীরযোদ্ধারূপী মেঘনাদ
:: কানাই দাস..৩৯০
৪১.নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত বেশভূষা :: সঙ্গীতা কর্মকার..........................৪০২
৪২.সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী গ্রেনেড: বাঙালির আত্মঅভিজ্ঞান
সন্ধানের আখ্যান :: ড. সুস্মিতা চৌধুরী..৪০৬
৪৩.চিহ্নতত্ত্ব ও কবিতার নিবিড় পাঠ :: মমতা চক্রবর্তী..........................৪১৭
৪৪.শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ: একটি
বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা :: প্রণয় সেন..৪২২
৪৫.বাক্যবৃদ্ধি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা :: ড. রামদাস বৈরাগ্য...৪৩২
৪৬.'বটতলা'র সাহিত্যে নারীদের উপস্থাপন
:: পিঙ্কি দাস মুখোপাধ্যায়..৪৩৬
৪৭.বিষয় ও প্রকরণের অভিনবত্বে ভিন্ন স্বাদের 'কমলা' পালা
:: অমল বেতাল..৪৪১
৪৮.আলেকজান্ডারপুরের কথকতা উপন্যাস : নিম্ন-মধ্যবিত্তের
সমাজ বাস্তবতা :: উর্মিমালা খাতুন..৪৪৮
৪৯.মার্ক্সীয় উদ্বৃত্তমূল্য এবং শ্রেণীভিত্তিক শ্রেণী সংগ্রামের একটি
সংক্ষিপ্ত রূপরেখা :: শুভজিৎ মন্ডল..৪৫৩
৫০.ব্রিটিশ ও তার তাঁবেদারদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলিমদের
সংঘাত ও পরিণতি :: তুহিন কুমার মৈত্র ৪৬৪
৫১.ভারতে দলিত শিক্ষার সমস্যা ও সমাধানে বর্তমান
সরকারের ভূমিকা :: ড. অরুণ মাইতি..৪৭১
৫২.ভাষা ও যোগাযোগে সৃজনশীলতা :: ড. শান্তনু বিশ্বাস..............৪৮০
৫৩. বৈদিক সাহিত্যে কৃষি: একটি পর্যালোচনা:: মনসা বর্মন..............৪৮৭
৫৪. আকাশের সত্তা সিদ্ধি :: ড. অপরাজিতা কুণ্ডু..........................৪৯৩
৫৫.কবি আমি ওদের দলে— আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
:: ড. টুম্পা ভট্টাচার্য..৫১১
৫৬. জলবায়ু পরিবর্তন এবং অতীত জলবায়ুর প্রমাণ:
একটি পর্যালোচনা :: প্রদীপ কুমার পাল..৫১৯
৫৭.মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত নারীদের কথা
:: ড. চৈতালী দাস..৫২৭

৫৮.পরিবেশবাদী নারীবাদ : পরিবেশ সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা
:: বুলবুল খানামী ৫৪৭
৫৯.শম্ভু মিত্রের উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথ :: অর্পিতা মুখার্জী ৫৫২
৬০.সময়, সমাজ এবং 'ঋণী' :: সুভাষ চন্দ্র দাস ৫৫৮
৬১.টেকসই উন্নয়নে নারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আর্থসামাজিক
প্রক্রিয়ার প্রভাব-একটি পর্যালোচনা :: সুজয় কুমার দাস....................৫৬৪
৬২.বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর
বিশ্বায়নের প্রভাব :: গোপাল চন্দ্র রায় ৫৭০
৬৩.ভারতীয় সমাজে নারীদের বিরুদ্ধে হিংসার প্রকৃতি
:: তনুশ্রী ভৌমিক ৫৭৬
৬৪.রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথায় ভাবনা শৃঙ্খলমুক্তির প্রসঙ্গ
:: অভীক দত্ত...৫৮৪
৬৫.সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার অবদান
:: প্রসেনজিৎ সাহা ৫৯০
৬৬.দেশ-বিদেশের জাতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ
:: নীলোৎপল রায়...৫৯৯
৬৭.'সওগাত' সমসাময়িক মুসলমান বাঙালি পরিচালিত
পত্র-পত্রিকার ধারা :: জ্যোতিশ্রী সরকার...৬১০
৬৮.কোচবিহার জেলার এক পুরাকীর্তি হাপড়া-সিদ্ধেশ্বরী মন্দির
:: জগদীশ সিং...৬১৮
৬৯.শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা : বর্তমান সমাজের প্রাসঙ্গিকতা
:: মণিকা বসুই...৬২৫
৭০.ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা: প্রসঙ্গ
তিন মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী :: সুব্রত দেবনাথ.................................৬৩৫
৭১.ভারতীয় অর্থনীতিতে পরিবর্তন : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা
:: ড. জয় নন্দী...৬৪১
৭২.শঙ্খ ঘোষের ছড়া সমগ্রে শিশুর জগৎ
:: ড.কৃষ্ণা কুন্ডু...৬৬৯
৭৩.মনমোহন বোস'র 'দর্পণ' : ঐতিহাসিক জীবনের প্রতিবিম্ব
:: ড. সুশান্তকুমার ভোমরা..৬৭৪
০০লেখক পরিচিতি..৬৮০
০০০UGC-CARE list...৬৮৪

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত গোপন-সাংকেতিক ভাষা : সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ

ড. এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

মানব সভ্যতার ইতিহাস বহু প্রাচীন। সুদূর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে বসবাস করত। সভ্যতার সেই আদিম স্তরে তারা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করত কীভাবে তা সঠিকভাবে আবিষ্কার করা এক প্রকার অসম্ভব। নৃতাত্ত্বিকেরা বেশ কিছু গুহাচিত্র, ছবি আবিষ্কার করেছেন। অনুমান করা যায় সেগুলি আদিম মানুষের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থাৎ সভ্যতার সেই আদিম স্তরেও মানুষ পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের চেষ্টা চালিয়েছে এবং সেই পথ ধরেই একদিন ভাষা সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীদের পার্থক্যের অন্যতম অধ্যায় ভাষা। অনেক প্রাণীই মুখ দিয়ে কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করে, তবে সেগুলি ভাষা নয়। সুগঠিত ভাষা সম্পদ একমাত্র মানুষই আয়ত্ত করতে পেরেছে। মানুষের ভাব বিনিময়ের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবেই ভাষার জন্ম বলে অনুমান করা যায়। তবে ঠিক কোন্ ভাষাটি সেদিনের মানুষ আবিষ্কার করেছিল বা বর্তমান দিনে প্রচলিত কোন্ ভাষার প্রত্নরূপ সেদিনের মানুষের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বিবর্তিত হয়েছে, তাই বলা যায় সেদিনের প্রত্নভাষা আদিম বিবর্তিত রূপেই বর্তমানের পৃথিবী ভাব বিনিময় করছে।

যে অনুসন্ধিৎসু মনের কারণে মানুষ সভ্যতার স্তর অতিক্রম করে আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছে সেই মনেই একসময় প্রশ্ন উপস্থিত হয়, ভাষা কি! উপলব্ধি করার চেষ্টা করে ভাষার প্রকৃত স্বরূপ। এই অনুসন্ধিৎসা পরবর্তীকালে জন্ম দেয় ভাষাবিজ্ঞান চর্চার। খুব সাধারণভাবে বলা যায় ভাষার রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে অন্বেষণের পথচলা তাকেই আমরা ভাষাবিজ্ঞান বলে বিবেচনা করতে পারি।

ভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রথম পথপ্রদর্শক হিসেবে আমরা যাদেরকে পাই তাঁরা হলেন

প্লেটো, অ্যারিস্টটল, দিওনুসিয়াস থ্রাক্স, পাণিনি প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই দার্শনিক। দর্শনতত্ত্ব আলোচনার মধ্যেও ভাষা নিয়ে কিছু কিছু মূল্যবান গবেষণা এঁরা করেছেন। জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের মতো করেই এঁরা ভাষাকে দেখেছেন এবং তার গঠনমূলক দিক নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। যেমন পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে চার হাজার সূত্রের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছেন। অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স গ্রন্থে ভাষা সম্পর্কে কিছু কিছু গঠনমূলক আলোচনা করেছেন। তবে ভাষার রীতি-নীতি পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক গঠন নিয়ে তাঁরা বিশেষ কিছু বলেননি। ভাষার গঠনগত দিক নিয়েই তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকেছে। আমরা জানি এঁরা কেউই যথার্থ ভাষাবিজ্ঞানী নন। পৃথিবীর প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক কে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব না। তবে ভাষা বিষয়ে মানুষের অনুসন্ধিৎসা যে বহু প্রাচীন তা নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই। ভাষা বিষয়ক প্রাচীন অনুসন্ধিৎসার উত্তরাধিকারস্বরূপ উনিশে শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে প্রথম ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশে ভাষা নিয়ে চর্চা শুরু হয়।

ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা শুরু হওয়ার পর প্রবহমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই গবেষণার পরিধি বিস্তৃত হয়। নানা শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয় ভাষাবিজ্ঞান চর্চা। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান, উপভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি। অ্যারিস্টটল ও পাণিনিরা ভাষাবিজ্ঞানের যে অধ্যায় নিয়ে কাজ করেছেন তা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, নোয়াম চমস্কি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতির পর ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে আসেন আরো নতুন মনীষী। তাঁদের ক্রিয়াশীলতার সূত্রে বিশ শতকে সমাজভাষাবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞানের জন্ম।

ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের ধারায় সমাজভাষাবিজ্ঞান একটি অতি নবীন শাখা। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে লস এঞ্জেলস এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই শাখার সূত্রপাত। Sociolinguistics এর প্রতিশব্দ রূপে ইংরেজিতে অন্য একটি শব্দ প্রচলিত আছে। সেটি হল Sociology of Language. এটি ব্যবহার করেছেন জে. এ. ফিশম্যান। Sociology of Language এর একটি সরল সংজ্ঞা দিয়েছেন উইলিয়াম ব্রাইট তিনি বলেছেন–

"The Sociology of Language is potentially a huge area, encompassing the full range of relations between language and society।[1]

Sociolinguistics বা Sociology of Language এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে সমাজভাষাবিজ্ঞান শব্দটি প্রচলিত। সমাজভাষাবিজ্ঞানের অনেক সংজ্ঞা বাংলায় প্রচলিত আছে। ভাষাবিজ্ঞানী রাজেশ্বর শ বলেছেন–

"ভাষা বিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আলোচিত হয় তাকেই আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান বলি।"[2] রাজীব হুমায়ুন বলেছেন– "সমাজ সংগঠন

মধ্যে মধ্যে ভাষা সংগঠনকে প্রভাবিত করে। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখা ভাষা সংগঠনের উপর সমাজ সংগঠনের প্রভাব বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়, তাকে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলে।"[৯]

এইসব সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভাষা ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভাষার উপর সমাজের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে সমাজ ও ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়। একটু উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

মানব সমাজ নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ ইত্যাদি নানা সীমারেখায় মানব সমাজ বিভাজিত হয়। এইসব সামাজিক শ্রেণিভেদ ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন শিক্ষিত সমাজের মানুষের ভাষার সঙ্গে অশিক্ষিত মানুষের ভাষার পার্থক্য আছে। একজন নারীর ভাষা সংগঠন ও একজন পুরুষের ভাষা সংগঠনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। সামাজিক স্তর অতিক্রম করে ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেও ভাষা পরিবর্তিত হয়। যেমন একজন শিক্ষকের ক্লাসরুমের ভাষা এবং তাঁর আড্ডার ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। আড্ডার পরিবেশে একজন শিক্ষকের মুখে স্ল্যাং শোনা যেতে পারে, কিন্তু সেই শব্দটি তিনি কখনোই ক্লাসরুমে ব্যবহার করেন না। নারীর ভাষা গঠনে বিবাহ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের ভাষায় পার্থক্য তৈরি হয়। 'আজ কি রান্না করেছিস' বা 'তোর ছেলে কেমন আছে' এই জাতীয় বাক্যালাপ অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না। অথচ বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের বাক্যালাপ অতি স্বাভাবিক বিষয়। বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান মেয়েদের জীবনকে আমূল বদলে দেয়। তার প্রভাব পড়ে তাদের ভাষা গঠনে। ছেলেদের ভাষায় স্ল্যাং এর ব্যবহার অত্যন্ত বেশি, তুলনায় মেয়েদের ভাষায় অনেক কম। আবার স্কুল পড়ুয়া বা কলেজ পড়ুয়া যুবকদের ভাষারও বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন রাস্তা দিয়ে সুন্দরী মেয়ে যেতে দেখে একটি ছেলে তার পাশের বন্ধুকে বলতে পারে 'মালটা হেব্বি তো'। ভাষার এই সংগঠন মেয়েদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। সুন্দর ছেলে দেখে তারা হয়ত বলে 'বাহ কি দারুন দেখতে!' এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে ছেলে এবং মেয়ের বাক্য গঠন, শব্দ ব্যবহারে অনেক পার্থক্য আছে। পেশাকে কেন্দ্র করেও ভাষাগত পার্থক্য তৈরি হয়। এক পেশার ভাষার সঙ্গে অন্য পেশার ভাষা মেলে না। মানুষের ভাষা গঠনের এইরকম সামাজিক প্রেক্ষিত সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাধীন।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাধীন এলাকাকে মোটামুটি চারটি শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়। দল-গোষ্ঠী সমাজের ভাষা, ভাষা বৈচিত্র্য, সামাজিক স্তর ও ভাষা স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভাষাগত পরিস্থিতি। যদিও সঠিক বিচারে সমাজভাষার এইরকম কোনো এলাকাকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাধীন

এলাকা গুলির মধ্যে গোপন সাংকেতের ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবেই বিবেচিত হয়।

সমাজের সব স্তরের সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে গোপন সাংকেতের ভাষা প্রচলিত আছে। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রামবাসী বা শহর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে গোপন সাংকেতের ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা আছে। আসলে সমস্ত ভাষাই হল সংকেত সমাহার বা ভাষার প্রত্যেকটা একক আসলে এক একটি সংকেত। যেমন কাকাতুয়া কথাটি বললে একটা পাখির ছবি আমরা মনে মনে কল্পনা করি। অর্থাৎ কাকাতুয়া শব্দটি ওই বিশেষ পাখিকে বোঝানোর সংকেত বিশেষ। সংকেত অনেক সময় মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা হয়, আবার অনেক সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া বা অন্যান্য অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়। সংকেত প্রকাশ করার মাধ্যম অনুযায়ী ভাষাকে বিভাজিত করা যায়। এই প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক রফিক হুমায়ুন বলছেন—

"কণ্ঠের ভাষা" বলতে মুখ দিয়ে উচ্চারিত এবং কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে 'অঙ্গের ভাষা' বলতে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ইশারা-ইঙ্গিতের ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। কণ্ঠের ভাষাকে 'উচ্চারিত ভাষা' এবং অঙ্গের ভাষাকে 'অনুচ্চারিত ভাষা'ও বলা যেতে পারে।"[৭]

বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা কণ্ঠের ভাষা বা উচ্চারিত ভাষাকে নিয়েই আলোচনা করব। মুখের ভাষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-প্রকাশ্য সাংকেতের ভাষা এবং গোপন সাংকেতের ভাষা। প্রকাশ্য সাংকেতের ভাষা সেগুলোই যা সর্বজনবোধ্য। সাধারণ সামাজিক তাদের দৈনন্দিন জীবনে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে সেটাই প্রকাশ্য সাংকেতের ভাষা। এই ভাষা একই ভাষাভাষী সকল মানুষের কাছে বোধগম্য। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেও এমন কিছু ভাষা ব্যবহার করা হয় যা সকলের বোধগম্য হয় না। এগুলোই গোপন সাংকেতের ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক রফিক হুমায়ুন গোপন সাংকেতের ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে—

"গোষ্ঠী বিশেষের গোপন ও সংকেতের ভাষা হচ্ছে গোপন সংকেতের ভাষা।"[৮]

গোপন সাংকেতের ভাষাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। অপরাধ জগতের ভাষা ও বাকচাতুরী। অপরাধ জগতে ব্যবহৃত গোপন ও সংকেত এর ভাষাকে অপরাধ জগতের ভাষা বলা হয়। অনেকে এই ভাষাকে পাতালপুরীর ভাষাও বলে থাকেন। অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা নিজেদের কথা ও কাজকর্ম সাধারণ সামাজিক, বিশেষ করে পুলিশের কাছ থেকে গোপন করার জন্য সংকেতময় ভাষা ব্যবহার করে। যেমন 'মাল খাইয়ে দেবো' এই বাক্যাংশের ব্যবহার সাধারণ সামাজিকের মধ্যে বিশেষ নেই। অথচ অপরাধ জগতে এটি বহুল ব্যবহৃত। অপরাধ জগতে মাল বলতে বন্দুকের গুলিকে বোঝানো হয়। খাইয়ে দেবো কথাটি গুলি করা হবে এমন হুমকি বা ভাব প্রকাশ করে। একইরকম পুলিশকে তারা ধরকাপুটি, টিকটিকি, মাছি ইত্যাদি নানা সংকেতে লুকিয়ে রাখে। 'ভাই' নামক বিশেষ সম্বোধন শব্দটি অপরাধ জগতে বহুল

পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এরা একে অপরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাই বলে সম্বোধন করে। ভাই বলতে তারা একই দলের লোকজনকে নির্দেশ করে। গোপন ও সাংকেতিক ভাষার ক্ষেত্রে অপরাধ জগতের ভাষার বাইরের সমস্ত ভাষা বাকচাতুরী নামে পরিচিত। বাকচাতুরীকে অনেক সময় চৌর নামেও চিহ্নিত করা হয়। সাহিত্যসহ সাধারণ সামাজিকের প্রাত্যহিক জীবনচর্চার মধ্যে বাকচাতুরীর প্রয়োগ অত্যন্ত বেশি। সাহিত্য ক্ষেত্রে বাকচাতুরী বিশেষ অর্থে বিভিন্ন অলংকার হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্লেষ অলংকার, বক্রোক্তি অলংকার সবই বাকচাতুরীর নামান্তর। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ কথাবার্তার সময় বাকচাতুরীর আশ্রয় নিলে সেখানে উদ্দেশ্যগত কিছু পার্থক্য থাকে। যেমন ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার জন্য বা বাকচাতুরীর আশ্রয় নেন। বাকচাতুরীর ব্যবহারগত বৈচিত্র্য থেকেই সমাজভাষায় গোপন সাংকেতিক ভাষার ধারণা পরিষ্কার হয়।

আলোচনার প্রথম পর্বে আমরা বলেছিলাম প্রায় সব শ্রেণীর মানুষ গোপন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে বয়স লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি নানা শ্রেণিভেদে গোপন ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। আমরা লক্ষ করেছি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও বিশেষ কিছু গোপন সাংকেতিক ভাষার প্রচলন আছে। শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরেও একই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও গোপন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। আমরা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের মধ্যে প্রচলিত গোপন সাংকেতিক ভাষার নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমাদের আলোচনা সেই নমুনাগুলোকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হবে।

সাধারণভাবে যেসব বিষয়কে প্রকাশ্যে বলা যায় না বা বলা উচিত নয়, সেগুলোই গোপন বা সাংকেতিক মধ্যে দিয়ে বলা হয়। সুস্থ সমাজব্যবস্থার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু বিধিনিষেধ থাকে। সেইসব বিধিনিষেধ প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করা একরকম সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। অথচ এই ধরনের বিধি প্রতিনিয়ত ভেঙে চলেছে আমাদের সমাজ। তাই বাহ্যিক আবরণ একান্ত প্রয়োজন। এ কারণেই অধিক ক্ষেত্রে সংকেতের আশ্রয় নেওয়া। সংকেতের মাধ্যমে কথা বলার প্রবণতা অন্যদের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীদের একটু বেশি। এক্ষেত্রে সামাজিক শিক্ষা বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সমাজ একটু বেশি সচেতনতা প্রত্যাশা করে। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনও বটে। কারণ বর্তমানের ছাত্রসমাজ ভবিষ্যতের নাগরিক। ফলে তাদের আচার-আচরণ, জীবনচর্চা থেকে জীবনশৈলী সবকিছুই নির্দিষ্ট ও সঠিক কিছু নিয়মের মধ্যে বিচরণ করা উচিত। আমরা বলতে পারি সামাজিক এই বিধি-নিষেধ অনেক সুন্দরভাবেই এখনো বজায় আছে। তাই এখনো ভারতবর্ষে সুস্থ নাগরিকের জন্ম হচ্ছে। তবুও নিয়ম মানার মধ্যে দিয়েও নিয়ম ভাঙার প্রবণতা ছাত্র সমাজের রয়েছে, তাই যেখানেই নিয়ম ভঙ্গ সেখানেই সংকেতের আশ্রয়। সংকেত এক্ষেত্রে ভেতরের কালিমাকে গোপন করার জন্য সহায়।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত কিছু গোপন সংকেতের ভাষা ও তাদের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ–

ক. ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত গোপন সংকেতের ভাষা-

ডবকা–

শরীরের দিক দিয়ে সুগঠিত মেয়েদের নির্দেশ করার জন্য ছেলেরা ডবকা শব্দটি ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে সেইসব মেয়েদের নির্দেশ করা হয় যাদের শারীরিক বৃদ্ধি স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি। মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে সরাসরি কথা বলা সামাজিক অপরাধ। অথচ ছাত্রদের বয়সজনিত কৌতূহলের কারণে এই জাতীয় প্রবণতা থেকে তারা নিজেদের দূরে রাখতে পারে না। ফলত সামাজিক বিধি-নিষেধকে মান্যতা দিয়ে তারা সংকেতের আশ্রয়ে নিজেদের মনগত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি ঘটায়।

পাখি–

এই শব্দটিও মেয়েদেরকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে গুরুজন বা সম্মাননীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকাকালীন সময়ে এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে কোনো মেয়ের কথা বোঝানোর জন্য পাখি কথাটি ব্যবহার করে। পাখি শব্দটি বলার মধ্য দিয়ে মেয়েদের শরীর বা বিশেষ অঙ্গ নিয়ে কোনো কথা নির্দেশ করা হয় না। সরাসরি একটি মেয়ের সার্বিক পরিচিতি দেওয়ার জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এগরোল/বিপিএল–

কিছু কিছু মেয়ের শারীরিক গঠন স্বাভাবিক হয় না। অনেকটা লম্বা ও রোগা মেয়েদের নির্দেশ করতে ছেলেরা এগরোল বা বিপিএল শব্দগুলি ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে সরাসরি মেয়েদের শারীরিক গঠনকে নির্দেশ করা হয়।

মাল–

ছেলেরা যে কোনো মেয়েকেই মাল নামে চিহ্নিত করে। ছাত্রদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার প্রচুর। বর্তমানে শব্দটি বাংলা স্ল্যাং এর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। অত্যধিক ব্যবহার এর মূল কারণ।

স্বাধীন–

আধুনিক জীবন সভ্যতায় বিবাহ পূর্বের যৌন সম্পর্ক অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছে। এই জাতীয় সম্পর্কের কবলে পড়ছে বহু অবিবাহিত কলেজ ছাত্রীরা। বিয়ের পূর্বেই জড়িয়ে পড়ছে শারীরিক সম্পর্কে। পরবর্তীতে অনেকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রকাশ্যেও চলে আসে। যেসব মেয়েদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে, তাদেরকে অন্যান্য ছেলেরা স্বাধীন বলে চিহ্নিত করে। স্বাধীন বলতে তারা বোঝাতে চায় এই বিশেষ মেয়েটি যৌনকর্মের জন্য শরীরের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আলুভর্তা–

শরীরের দিক দিয়ে যেসব মেয়েরা একটু মোটাসোটা হয় তাদেরকে নির্দেশ করতে ছেলেরা আলুভর্তা শব্দটি ব্যবহার করে। বোঝানো হয় আলুভর্তা যেমন নরম,

এই মেয়েটির তেমনি নরম।

খোলতাই/মাখন–

শরীর ও রূপের দিক দিয়ে আদর্শ মেয়েদের বোঝানোর জন্য খোলতাই, মাখন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে ছাত্রসমাজ। সেই মেয়েকেই খোলতাই নামে চিহ্নিত করা হয়, যে দেখতেও খুব সুন্দর এবং যার শারীরিক গঠন যথাযথ।

বাবার প্রসাদ–

গাঁজা মাদক সেবনের প্রথাকে বোঝাতে ছাত্ররা বাবার প্রসাদ কথাটি ব্যবহার করে। গাঁজা সেবন করা সামাজিক ও আইনগত উভয় দিক দিয়ে অপরাধ। তাই সরাসরি গাঁজা খাব বা গাঁজা টানবো কথাটি ছাত্ররা ব্যবহার করে না। পরিবর্তে বাবার প্রসাদ নেব কথাটির ব্যবহার বেশি।

বাবাজীকা টুম্বু–

এটিও গাঁজার সাংকেতিক নাম। বাবাজি বলতে ছাত্ররা দেবতা মহাদেবকে বোঝায়। টুম্বু হল গাজার কলকে। কলকে মাটি দিয়ে তৈরি একটি বিশেষ যন্ত্র। এর মধ্যে গাঁজা ঢুকিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে সেবন করা হয়।

হাতের কাজ–

মাস্টারবেশন করা ছাত্র যুবকদের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পৃথিবীর সব দেশের ছেলেরা এই বদ অভ্যাসে আসক্ত। মাস্টারবেশন করাকে ছাত্রসমাজ হাতের কাজ নামে পরিচিত করে। সামাজিক যৌন উদ্দীপনা প্রশমন করার এই পদ্ধতিটি প্রায় সকলের জানা। অথচ এটাই সামাজিক স্তরে লজ্জাজনক বিষয়। তাই ছাত্ররা সামাজিক লজ্জার হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলে নেওয়ার জন্য হাতের কাজ কথাটি ব্যবহার করে।

লাঠি খেলা–

কলেজ ছাত্রদের মধ্যে পর্ন দেখার প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। অথচ এই কাজটি শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এটা জানা সত্ত্বেও ছাত্ররা এই অভ্যাস থেকে নিজেদের বিরত করতে পারে। বর্তমানে ছাত্র-যুবকদের পর্ন এর প্রতি আসক্তির পরিমাণ এত বেড়েছে যে, বিষয়টি সামাজিক ব্যাধি বলে বিবেচিত হচ্ছে। পর্ন দেখা ও সেই বিষয়ে আলোচনা করা থেকে তারা বিরত থাকতে পারছে না। এই অবস্থায় বাহ্যিক আবরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই পর্ন শব্দের বিকল্প প্রতিশব্দ বা সাংকেতিক শব্দের উৎপত্তি। সামাজিক স্তরে লাঠিখেলা, ডিং ডং, মশলা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে ছাত্র-যুবকরা বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

লিশি –

ধূমপান করার জন্য বিড়ি ব্যবহার করে বহু মানুষ। বিড়িকে ছাত্ররা লিশি নামে চিহ্নিত করে।

Everybody/Nobody–

ইংরেজি Everybody শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ যে কেউ বা সবাই। বিড়ি শব্দের সাংকেতিক নাম হিসাবে Everybody কথাটি ব্যবহার করে ছাত্রসমাজ। শব্দটি ব্যবহারের পিছনে বিশেষ আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত কাজ করে। আমাদের দেশের গ্রামকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থায় বিড়ির দাম খুব কম। ফলে বিড়ি যে কাউকে দেওয়া যায়। কোনো ছাত্র এক প্যাকেট বিড়ি কিনলে তা অনেক বন্ধুদের মধ্যে বিলি বিতরণ করে যেতে পারে। দাম কম হওয়ার জন্য এটা সম্ভব হয়। তাই বিড়িকে তারা Everybody নামে চিহ্নিত করে। এর ঠিক বিপরীত শব্দ Nobody। যার অর্থ কেউ না। এটি ব্যবহার করা হয় সিগারেটের ক্ষেত্রে। সিগারেটের দাম বিড়ির তুলনায় অনেকটাই বেশি। তাই সিগারেট কিনে অন্যদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব নয়। ছাত্রদের আর্থিক অবস্থা কখনোই খুব ভালো হয় না। বাড়ি থেকে দেওয়া হাত খরচের উপর নির্ভর করেই তাদের চলতে হয়। এই অবস্থায় প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট কিনে বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করার সুযোগ সবার থাকে না। তাই সিগারেটকে তারা Nobody নামে চিহ্নিত করে। এখানে ছাত্রদের মানসিক অবস্থান থাকে এই রকম- বিড়ি Everybody, যে পারবে নিয়ে খাও, কিন্তু সিগারেট Nobody, এটা কাউকে দেওয়া যাবে না।

গৌরচন্দ্রিকা–

যারা মদ খায় তারা মদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক স্বাভাবিক খাবার খেয়ে থাকে। যেমন চানাচুর, চিপস, কোলড্রিংস, মাংস, ছোলা ও বিভিন্ন ফল। মদের সঙ্গে খাওয়া এইসব সাধারণ খাবারকে বলে চাট। চাট কথাটি মদ খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান সমাজে ছাত্রদের মধ্যেও মদ খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। কিন্তু মদ খাওয়া সামাজিক দিক দিয়ে অপরাধ। ছাত্রদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো বেশি অপরাধের। অপরাধ জেনেও এই ক্ষতিকর নেশায় আক্রান্ত হচ্ছে বর্তমানের ছাত্রসমাজ। যদিও প্রকাশ্যে মদ খাওয়ার মত দুঃসাহস সবাই দেখাতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটু লুকিয়ে বা আড়ালে অবডালে মদ্যপান করে তারা। আড়ালে বসে মদ্যপান করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পরিকল্পনা হয় প্রকাশ্যে। মদ খাওয়ার পরিকল্পনায় অনিবার্যভাবে আসে চাটের প্রসঙ্গ। তখন চাটকে ছাত্ররা গৌরচন্দ্রিকা বলে চিহ্নিত করে। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী গৌরচন্দ্রিকা শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। রাধাকৃষ্ণের পালাকীর্তন শুরু করার আগে মুখবন্ধস্বরূপ কিছু গান গেয়ে নেওয়া হত। সেই গানগুলোকেই গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। এখানে মদ খাওয়ার অনুষঙ্গে গৌরচন্দ্রিকা শব্দটি ব্যবহার করে ছাত্রসমাজ চাট খাওয়ার প্রসঙ্গকে ব্যাখ্যা করে।

দুধ/দই/ঘি–

প্রকাশ্যে বীর্য সম্পর্কে কোনো কথা বলার জন্য ছাত্রসমাজ দুধ, দই, ঘি ইত্যাদি নানা শব্দ ব্যবহার করে।

তানপুরা–

মেয়েদের ভারী পশ্চাৎদেশ বোঝাতে ছেলেরা তানপুরা কথাটি ব্যবহার করে।

বমি করা–

ছেলেদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় স্বপ্নদোষ একটি বিশেষ অধ্যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটি রোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিকাংশ ছাত্র-যুবক এই রোগে আক্রান্ত। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে আড়ষ্টতাও রয়েছে বিশেষ পরিমাণে। বিষয়টিকে ছাত্ররা বমি করা বলে চিহ্নিত করে।

ছাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত কিছু গোপন সংকেতের ভাষা ও তাদের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

স্বভাবগত দিক দিয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা একটু নম্র ভদ্র ও নিয়মানুগ হয়। সামাজিক শিক্ষার প্রভাব ছেলে অপেক্ষা মেয়েদের মধ্যে বেশি। ফলত মেয়েরা সামাজিক স্তরে বাহ্যিক দিক দিয়ে অনেক শান্তশিষ্ট ও নিয়মানুবর্তি হয়। তবে মেয়েদের মধ্যেও গোপন বিষয় থাকে। তারাও নিজেদের মধ্যে অনেক গোপন বিষয়ে কথা বলে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কোনো গোপন বিষয়ে কথা বলার জন্য মেয়েরা সংকেতের ভাষ ব্যবহার করে। কলেজ ছাত্রিদের মধ্যে প্রচলিত এমনই কিছু সাংকেতিক ভাষা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেগুলি নিম্নরূপ–

লাল পতাকা/কমল নাম/CPM–

মেয়েরা নিজেদের ঋতুমতী অবস্থা বোঝাতে লাল পতাকা, কমলনাম, CPM ইত্যাদি নানা শব্দ ব্যবহার করে। মেয়েদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় ঋতুস্রাব খুব স্বাভাবিক বিষয়। তবুও অন্যদের কাছ থেকে এই অবস্থাকে তারা গোপন রাখতে চায়। তাদের ধারণা ঐ বিশেষ অবস্থার কথা সকলের কাছে, বিশেষ করে পুরুষদের কাছে প্রকাশ করাটা ক্ষতিকারক। এই রকম ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবুও তারা সহজভাবে এটাকে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু বন্ধুমহলে এর কথা প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা নেই। সে ক্ষেত্রে তারা 'আমি লাল পতাকা' 'আমি সিপিএম' 'আমার কমল নেমেছে' ইত্যাদি বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে।

আমারটা/তোরটা–

পুরুষ বন্ধুকে বোঝানোর জন্য মেয়েরা আমারটা বা তোরটা শব্দটি ব্যবহার করে। নিজের পুরুষ বন্ধু সম্পর্কে কথা বলার সময় মেয়েরা বয়ফ্রেন্ড বা পুরুষ বন্ধু শব্দগুলি ব্যবহার না। তারা আমারটা কথাটি ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে বিশেষ মেয়েরা ছাড়া অন্যরা এই কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারেনা, অথচ নিজেরা ভাব বিনিময় করে নেয়। আবার একান্ত আপন বান্ধবীর পুরুষ বন্ধুর সম্পর্কে কথা বলার সময় তোরটা শব্দটি ব্যবহার করে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ পূর্ববর্তী প্রেম এখনো সেই ভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায়নি। ফলত মেয়েরা বিবাহ পূর্বের প্রেমকে যতটা সম্ভব গোপন করতে চায়। একই মনোভাব ছেলেদের মধ্যেও সমান ভাবে কাজ করে। এই জন্য গোপনসাংকেতের ভাষা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কেউটে সাপ/থার্মোমিটার–

ছেলেরা যেমন মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, মেয়েরাও তেমন পুরুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে পুরুষের যৌনাঙ্গকে কেউটে সাপ/থার্মোমিটার ইত্যাদি সাংকেতিক শব্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে। এখানেও সামাজিক সম্মানবোধ ও লজ্জাবোধ বিশেষভাবে কাজ করে মেয়েদের মধ্যে।

গোপন সংকেতের ভাষার অর্থ বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব না। বক্তা ও শ্রোতার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর এর অর্থ নির্ভর করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোপন সংকেতের ভাষার রূপগত পরিবর্তন ঘটে। তাই দেখা যায় একই বিষয়কে বোঝাতে একাধিক শব্দ প্রচলিত হয়। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু গোপন শব্দের অর্থ সাধারণ সামাজিকের বোধগম্যতায় চলে আসে। তখন বিকল্প শব্দ বেছে নিতে হয় ভাষাব্যবহারকারিকে। এই ভাবেই গোপন সংকেতের ভাষায় বৈচিত্র্য আসে। যা সর্বোপরি ভাষার শব্দভাণ্ডারকে উৎকৃষ্ট করে। সমাজভাষাবিজ্ঞানের সার্বিক আলোচনায় তাই গোপন সংকেতের ভাষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক আলোচনা হওয়া দরকার। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোপন সংকেতের ভাষা সংগ্রহ ও তার নিবিড় বিশ্লেষণ সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিধিকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন সকলের বহুমুখী পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। সীমিত সক্ষমতায় আমরা কিছুটা চেষ্টা করেছি মাত্র।

তথ্যসূত্র:

১. Bright, Willian (Chief ed.), International Encyclopedia of Linguistics, Vol-4, Oxford Uni.Press, 1994

২. শ' রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.- ৬১৬

৩. হুমায়ুন রাজিব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ.-১১

৪. হুমায়ুন রাজিব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ.-১১

৫. হুমায়ুন রাজিব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ.-১১

UGC CARE LIST I_2021 (Arts and Humanities)

43.	Chinuku Maasa Patrika (print only)	Chinuku Publications	2455-4111	NA
44.	CLIO An Annual Interdisciplinary Journal of History (print only)	Corpus Research Institute	0976-075X	NA
45.	[illegible]	Association Francaise de Linguistique Cognitive	NA	1958-5322
46.	Comparative Philosophy	Center for Comparative Philosophy, San Jose State University	NA	2151-6014
47.	Critic: Journal of the Centre of Russian Studies	Centre of Russian Studies, School of Language, Literature & Culture Studies, Jawaharlal Nehru Univ	2229-7146	NA
48.	Dance Education in Practice	Taylor and Francis	2373-4833	2373-4841
49.	Darsanikl (print only)	Department of Philosophy, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith [illegible]	2230-7435	NA
50.	Darshnik Traimasik		0974-8849	NA
51.	Dastak (print only)	Department of Urdu, Faculty of Arts, Banaras Hindu University	NA	NA
52.	Dastavej (print only)	Central Institute of Hindi	2348-7763	NA
53.	Dharmadoot	Maha Bodhi Society of India	2347-3428	NA
54.	Dhimahi (print only)	Chinmaya International Foundation Shodha Sansthan	0976-3066	NA
55.	Dibrugarh University Journal of English Studies	Department of English, Dibrugarh University	0975-5659	2581-7833
56.	Dirasat Arabia (print only)	Centre of Arabic and African Studies, Jawaharlal Nehru University	2348-2613	NA
57.	Discours	Universite de Paris-Sorbonne	NA	1963-1723
58.	Drishti: The Sight	Drishti: The Sight	2319-8281	NA
59.	Drishtikon (print only)	Drishtikon Prakashan	0975-119X	NA
60.	Ebong Mohua (print only)	K. K. Prakashan	NA	NA
61.	Ebong Mushayera (print only)	Ebong Mushayera	0976-9307	NA

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৫ জানুয়ারি ২০২৪

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 11th Issue 25th, Jan., 2024

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চিকনেড়িয়া, মাজনপাড়ী, পো: - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150, Vol. 11th Issue 25th, 29th Jan., 2024, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১১ তম বর্ষ ও ২৫ তম সংখ্যা
২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিস্টার্ড অফিস
চণ্ডীবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৫১৮২
সার্বিক সহায়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০২১৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৬৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

সূচিপত্র

সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী গ্রেনেড : নারীর দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ
মাখন চন্দ্র রায় ১৫

ঔপনিবেশিক বাংলায় পিকনিক : একটি অচর্চিত
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনুসন্ধান
সুমন মুখার্জী ২৩

বিশ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে
নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ
শবানা আজমী ৩২

শ্রীশ্রীগোবিন্দকাব্যের রচয়িতা 'কবি জয়দেব' : একটি
সমীক্ষামূলক আলোচনা
দেবব্রত বৈদ্য ৪২

উত্তর আধুনিক কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতার গতি প্রকৃতি
আজাহারউদ্দিন মিয়া ৫৬

মার্কসীয় মতাদর্শ সমৃদ্ধ বাংলা প্রবন্ধের ধারা : বিশশতকের শেষার্ধ
অমিত দে ৬৩

মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে প্রেম ভাবনা
শেখ কামাল উদ্দীন ৭২

রবীন্দ্র নাটকে ঠাকুরদাদা : নানা সাজে, নানা কাজে
ঈশিতা খাঁ ৭৯

আত্মশোক সম্ভাবনা রূপে মৃত্যু- একটি হাইডেগেরীয় পর্যালোচনা
সৌভিক ঘোষ ৮৯

ঔপনিবেশিকতার আলোকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান
সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী
অম্বরীশ ঘোষ ৯৭

চিত্রাঙ্গদার নবজন্ম : সীমাবদ্ধ এক নবজাগরণ
পল্লব বৈরাগ্য ১০৬

মুক্তা : মেয়েটির নাম সুহাসিনী রাখা হইয়াছিল...
আকাশ বিশ্বাস ১১৬

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের লালসালু উপন্যাস এক নতুন বিচার
সৈয়দ রাফিকা সুলতানা ১২২

বিচ্ছেদের মাঝে মিলন মহান : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
'দুরাশা' ও 'মুসলমানীর গল্প'
বিকাশ কামিল্যা ১৩১

বুদ্ধদেব গুহ-র 'গুগুনোগুম্বারের দেশে' উপন্যাসে মাসাই জনজীবন
গনেশ কর্মকার ১৩৯

ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে দয়ানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীর সৃষ্টিতত্ত্ব
তপন রুইদাস ১৪৭

তামিল গল্পকার ধনপতি ভাস্করনের লেখা সুব্রাহ্মণিয়ন
কৃষ্ণমূর্তির অনূদিত 'দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন'
গল্প : পাঠান্তর অনুভব
এ. টি. এম. সাহানাউল্লা ১৫২

গণতন্ত্রে মহিলাদের অবস্থান: ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে একটি সম্যক বিশ্লেষণ
স্বপন শর্মা ১৬০

হুগলী জেলায় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার (১৮১৮-১৯৪৭) : তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ
প্রিয়াঙ্কা ঘোষ ১৭৮

ভারতে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন : প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ
সৈকত মিত্র ১৮৭

পশ্চিমবাংলার কৃষি
তুহিন কুমার মৈত্র ১৯৫

একাত্তরের দিনগুলি ও মুক্তিযুদ্ধ : রাজনৈতিক
পরিচয় ও পরিচয়ের রাজনীতি
সুপর্ণা মন্ডল ২০০

কাশীপুরের মাই বিবি : শতাব্দী প্রাচীন লৌকিক কিংবদন্তির
এক অন্যতম নিদর্শন
সাইদা খাতুন ২০৬

অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্প বৈচিত্র্যময়তা (নির্বাচিত)
অর্পণ রায় ২১০
প্রমথনাথ চৌধুরীর 'হারানো খাতা' : হয়ে ওঠা জীবন ও কতিপয় ভাবনা
মোসাহিদা খাতুন ২১৮
'ঘুনঘুনুরা': প্রবীণ দম্পতীর পত্র-বাসনের আখ্যান
শুচিস্মিত কাজি ২২৭
বিবেকানন্দের Practical বেদান্তের একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
আসমিন শেখ ২৩৪
আলপনা : বাংলার অনন্য লোকশিল্প
শ্রী ভট্টাচার্য ২৪৩
বঙ্কিমচন্দ্রের অমরনাথ : অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের টানাপোড়েন
সিদ্ধার্থ ঘোষ ২৫০
শৈলী বিজ্ঞানের আলোকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
কবিতার শৈলী বিচার
অচিন্ত্য কুমার দাস ২৫৫
'বঙ্গবাণী' নাট্য পত্রিকার সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস
মিলন সিংহ ২৬৪
গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারী সুরক্ষার্থে ভারতীয় দণ্ডবিধি : সাম্প্রতিক মূল্যায়ন
শর্মিলা রায়
স্বরাজ বক্সী ২৭৩
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবি
গোকুল বর্মন ২৮২
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় 'স্বদেশ ভাবনা'
রসরাজ রায় ২৯২
শনপুতুলের কুন্তী : মানব মনস্তত্ত্বের এক নিবিড় পাঠ
প্রিয়াঙ্ক ভট্টাচার্য ৩০০
জগদীশ মিত্রের ছোটগল্প : শোষক-শোষিতের সম্পর্কের অভিনব রূপায়ন
রঞ্জিত কিশোর দে
হৈমন্তী সরকার ৩০৫

সমকালীন প্রেক্ষাপটে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক (নির্বাচিত)
উজ্জ্বল দাস ৩২০
রজনীকান্ত বরদলৈ : অসমের বঙ্কিমচন্দ্র
নির্মল বেরা ৩২৬
উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' : একটি পরাধীন
জাতির বিদ্রোহের দুঃস্বপ্ন
মৌসুমী পাল ৩৩৩
কমলকুমার মজুমদারের মল্লিকাবাহার : বাংলা ছোটোগল্পে
এক স্বতন্ত্রের শিল্পী
ভগীরথ নন্দী ৩৩৬
উনিশে শতকে বাংলার বাবু ভদ্র সমাজ : একটি পর্যালোচনা
স্বপন দোলই ৩৪৫
সত্তর দশকের দেশ-এ বিদ্ধ যুবমানস : দুটি গল্পের অন্য অনন্য স্বর
বর্ণালী পাল ৩৫৭
কবিতার অস্তিত্বে জীবনের খোঁজ
দীপক কুন্ডু ৩৬১
বিশ শতকে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে
চীনা চিকিৎসা বোধের উদ্ভব ও বিকাশ
কৌশিক কুন্ডু ৩৭৫
ভারতবর্ষের অন্য নাম : মিলন মুখোপাধ্যায়ের 'মুখ চাই মুখ' উপন্যাস
ড. সৌরভ চট্টোপাধ্যায় ৩৮৩
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার বিস্মৃত, বিপ্লবীদের কথা
তরুণশঙ্কর পাত্র ৩৮৮
শিশুর সামাজিক প্রতিকূলতার নিরিখে তিনটি নির্বাচিত রবীন্দ্র ছোটোগল্প
শ্রেয়া চৌধুরী ৩৯৯
দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার আদিবাসী সংস্কৃতি : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
সাজন সেকদার ৪০৩
নবনীতা দেবসেনের ছোটোগল্পে নারী : সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে
সন্দীপ মুখার্জী ৪১৩

ত্রিপুরার নাতজাই কের : ঐতিহ্যে ও সাহিত্যে

জীবনকৃষ্ণ পাত্র ৪২০

বিপ্লবী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ ও মহান বিপ্লবী নলিনী বাগচি

বিদ্যুৎ সরকার ৪৩০

অনিল ঘড়াইয়ের আদিবাসী নারী : মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও দৌড়

অধরার লড়াই নির্বাচিত ছোটগল্পের নিরিখে

মন্দিরা মুর্মু ৪৩৭

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের লোকায়ত শিক্ষানীতি - প্রসঙ্গ

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র

চৈতালী কবিরাজ ৪৪২

মৈমনসিংহ গীতিকায় উল্লিখিত পিঠে-পুলি, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জন শিল্প – একটি

সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় কুমার দাস ৪৫২

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' : একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর জাগরণের ইতিকথা

দীপ্তি রায় ৪৬১

নব ধর্মের অভ্যুদয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

অভিজিত মণ্ডল ৪৬৬

নিম্নবর্গের নারীর পেশাগত বিবর্তন রূপান্তর : পশ্চিমবঙ্গের

আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

অসীম বিশ্বাস ৪৭৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে নায়কের নিঃসঙ্গতা

অর্পিতা দেবনাথ ৪৮৩

বাংলার পৌণ্ড্র সমাজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা

সমীর মণ্ডল ৪৯২

Yoga and Positive Psychology - a personal experience

Shaona Sengupta ৪৯৬

UNVEILED VOICES OF WOMEN : THE

EVOLUTION OF WOMEN'S RIGHT IN COLONIAL BENGAL

Rudrani Bhattacharya ৫০১

GLOBALIZATION AND THE PREPARATION OF SKILLED, QUALITY TEACHERS : NEED OF THE HOUR
Shree Chatterjee ৫১৫

Women issues in the 19th century India
Abinash Sengupta ৫২৪

IMPACT OF COVID-19 ON EDUCATION SYSTEM-EVIDENCE FROM A SURVEY ON UNDERGRADUATE AND POST GRADUATE STUDENTS IN KOLKATA
Sourav Das ৫৩৩

A JOURNEY TOWARDS FINDING OWN LANGUAGE OF PROTEST : MICHAEL MADHUSUDAN DUTT
Prama Bhattacharjee ৫৪৪

Kumārila Bhaṭṭa : A Hindu Philosopher
Sudipta Sau ৫৫৫

PEACE : MEANING AND CONCEPT
Santanu Ger ৫৬৩

Early Childhood Education : The Montessori Approach and the Reggio Emilia Theory
Subrata Acharyya
Nasiruddin Khan ৫৬৮

Locational Factors of Food Park, case study on Sankrail Food Park, Howrah
Sumana Das ৫৭৯

CULTURAL ATTRIBUTES OF THE KURMI MAHATOS : REFLECTIONS FROM KARAM PUJA
Sanchita Bhattacharya ৫৮৬

Raja Ram Mohan Roy : The pioneer of scientific religious reformer to the Indian Society
Somnath Roy ৫৯৪

Migration - an Overview on Terminology and Historical discourse
Sudipta Sardar ৬০৩

Rise And Growth of The Middle Class and Socio - Economic Hegemony in the 19th And 20th Century Cooch Behar
Gour Kishore Dey ৬১২

Development of Electricity in Colonial Darjeeling : 1895-1947
Nirmal Mandal ৬২৩

Values and Ethics
Paramita Datta ৬২৮

তামিল গল্পকার ধণ্ডপানি জয়কান্তনের লেখা সুব্রাহ্মনিয়ান কৃষ্ণমূর্তির অনূদিত 'দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে' গল্প : পাঠান্তের অনুভব

এ. টি. এম. সাহানাজুল্লা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটি

সারসংক্ষেপ: প্রতিবেশী সাহিত্যপাঠ যেকোনো সাহিত্য পাঠকের সাহিত্য রসাস্বাদন সুযোগ বাড়িয়ে দেয় অনেকাংশে। তেমনই আগ্রহ নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পাঠ করার সূচনা। পরবর্তীতে এই ক্ষেত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা সর্বাংশে। এই ক্ষেত্রে বাংলায় অনূদিত সাহিত্যই একমাত্র আশ্রয়। তামিল গল্পকার ধণ্ডপানি জয়কান্তনের লেখা সুব্রাহ্মনিয়ান কৃষ্ণমূর্তির অনূদিত দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গল্পটি পাঠ পূর্বক অনুভূতি ব্যক্ত করার চেষ্টা হবে এই আলোচনায়।

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের জীবন নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। যেখানেই নিয়মের বিচ্যুতি সেখানেই সহ্য করতে হয় নিষ্ঠুর পরিণাম। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আম্মাশির ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। প্রথম যৌবনে সাধারণ সামাজিক জীবন অপেক্ষা সৈনিক জীবনকে সে আপন করে নিয়েছিল। ফলস্বরূপ শেষ বয়সে সে নিতান্ত একা হয়ে যায়। একাকিত্বের সেই জীবন থেকে আম্মাশি মুক্তি পায় চিরায়ত পারিবারিক জীবনের পথে। আম্মাশির জীবনের এই পরিণতির কথা আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান পাবে।

সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য মানুষের জীবনকে চরম প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। আলোচ্য গল্পটি এমনই এক প্রসঙ্গে আলোড়িত হয়েছে। যুবকেরাও আম্মাশি সামাজিক জীবনে জায়গা না পেয়ে অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়ায়। ট্রেনে তার সঙ্গে দেখা হয় এক অসহায় মহিলা ও তার শিশু কন্যার সঙ্গে। ব্যক্তিজীবনে এই মহিলা শ্রেণিবৈষম্যের শিকার হয়েছে চরম আকারে। এখন সে বিধবা ও যক্ষা রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আম্মাশি এই মহিলা ও তার মেয়েকে দুধ কিনে খাওয়ায়, তাদের জন্য ট্রেনের টিকিট কিনে দেয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এই মহিলা সামাজিক বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে তার কন্যাকে সঁপে দেয় আম্মাশির হাতে। আম্মাশিও পরম স্নেহে তাকে নিজের জীবনে বরণ করে। ব্রাহ্মণ শিশুর সঙ্গে নিম্ন জাতের আম্মাশির মিলনের মধ্যে দিয়ে গল্পকার শ্রেণিবৈষম্যের হাত থেকে মানব সভ্যতার মুক্তির পথানুসন্ধান করেন। আমাদের আলোচনায় গল্পের এই দিকটি বিশেষভাবে মূল্য পাবে।

মূল শব্দ

- জীবনের পথে সময়ের গুরুত্ব।
- সামাজিক স্তরে বর্ণবিভেদের প্রভাব ও তার থেকে উত্তরণের পথান্বেষণ।

মূল আলোচনা

বাঙালি হিসেবে বাংলাসাহিত্য পাঠের পাশাপাশি প্রতিবেশী সাহিত্য পাঠের নেশা ঠিক কখন শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে শুরু যেখানেই হোক সহজে এর থেকে মুক্ত হতে পারব বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি মুক্ত হওয়ার একান্ত ইচ্ছাও নেই। তামিল গল্পকার দণ্ডপাণি জয়কান্তনের লেখা সুব্রহ্মণ্যম কৃষ্ণমূর্তির অনূদিত দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গল্পটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। গল্পটির বিষয় অতি সাধারণ। প্লটের জটিলতা একেবারেই নেই। ছোটগল্পের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী এখানেও একটি মাত্র ঘটনা দ্রুত গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। অতি সাদামাটা গঠনের এই গল্পটি পাঠ করার পর একে নিয়ে ভাবতে হয় অনেক বেশি। বর্তমান আলোচনায় তেমনি কিছু ভাবনার কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে।

দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয় আম্মাসি নামক এক বাতিল সৈনিকের জীবনের কথা। লেখক এই সৈনিকের জীবনেতিহাস বর্ণনার মধ্যে দিয়ে মানবসভ্যতার ও মানবজীবনের নানা জটিলতম দিক পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তার প্রত্যেক উপাদানকে সঠিকভাবে নির্মাণ করেছে। প্রকৃতির উপাদান হিসেবে মানুষকেও নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মের কঠিন বেড়াজালে আবদ্ধ। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় উদ্দাম জীবনযাপনের জন্য মানুষ এক হিসাবে প্রকৃতিকে আক্রমণ করে প্রতি মুহূর্তে। তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া মানুষকেই সহ্য করতে হয় সবচেয়ে ভয়াবহ রূপে। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল সমস্যা প্রাকৃতিক দূষণ। প্রশ্ন ওঠে প্রাকৃতিক দূষণের মূল দায়ী কে? উত্তরে মানুষের বিবেকহীন আচরণের কথাই সবার প্রথমে বলতে হয়। সৃষ্টিকে এবং জীবনকে বেশি করে ভোগ করতে গিয়ে বর্তমান মানুষ এতটাই হিংস্র হয়ে উঠেছে যে, গভীর প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব। সভ্যতা যেভাবে প্রকৃতির সঙ্গে আচরণ করবে প্রকৃতিও ঠিক সেই ভাবেই সভ্যতা ও সমাজকে তা ফেরত দেবে। বর্তমানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সারা পৃথিবী যেভাবে আতঙ্কিত হচ্ছে তা সর্বাংশে মানুষের সৃষ্টি। দেনাপাওনার এই সাধারণ সূত্র শুধুমাত্র প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। মানুষের জীবনেও দেনাপাওনার এই কঠোর হিসেব সমানভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষ তার জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, জীবনও সেই ভাবেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সৃষ্টির প্রত্যেকটা জীব প্রকৃতির কোলে লালিত। ফলে প্রকৃতির সুবিধা

সেভাবে সৃষ্ট সবের তার প্রতি বেশ কিছু দায়িত্ব প্রত্যেক জীবকে পালন করতে হয়। প্রকৃতির সদস্য হিসেবে মানুষেরও এমনই কিছু দায়িত্ব আছে। প্রত্যেক মানুষের উচিত সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা ও প্রকৃতিকে তার নির্দিষ্ট গতিতে বয়ে চলবার সুযোগ করে দেওয়া। যেখানেই এই প্রচেষ্টা ও দায়িত্ববোধের অভাব তৈরি হয় সেখানেই মানুষটিকে ভোগ করতে হয় শাস্তি। আমাদের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আম্বানি প্রকৃতির এই দায়িত্ববোধ যথাযথভাবে পালন করেনি। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে আম্বানি বুঝতে পারেনি জীবনের পথে সময়ের গুরুত্ব ঠিক কতটা। জীবনের কোন্ পর্বে ঠিক কোন্ কোন্ কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। যখন তার শরীরের ঘরে যৌবনের উচ্ছ্বাস ছিল তখন সে সময় অনুযায়ী কাজ করেনি। এর ফলও তাকে ভোগ করতে হয়েছে কঠোরভাবে।

পরিবারজীবন, সংসার, সমাজ এইসব অতি সাধারণ সত্য অনেক সময় অনেক মানুষের কাছে নিতান্তই বিলাসিতা বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতির সুষ্ঠু গতির জন্য প্রত্যেক মানুষকে এই সাধারণ জীবন চক্রের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। এই বন্ধন যে অস্বীকার করবে পরবর্তীতে তাকে ভোগ করতে হবে অনিবার্য কুফল। যৌবনের দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে আম্বানি জীবন যাপনের বিরুদ্ধ পথকে বেছে নিয়েছিল। সৃষ্টির মূল সত্যকে মেনে নিয়ে কোনো নারীকে ভালোবেসে সৃষ্টির গতিকে বহমান রাখার পরিবর্তে সে নিজের জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল একটু অন্য পথে- "এটা আশ্চর্য নয় যে সে বিভিন্ন দেশে নানারকমের মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আর বিশাল বিশ্বের সঙ্গে একা মেলামেশার জন্য জীবনকে ভালোবেসেছিল।" এইভাবে জীবনকে উপভোগের জন্য সংসার অপেক্ষা বেশি পরিমাণে ভালোবেসেছিল যুদ্ধক্ষেত্রকে। সাংসারিক বিষয়ে আম্বানির অনুভূতি লেখক বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে-"ও যুদ্ধকেই বিয়ে করেছে, ব্যারাক ছিল ওর শ্বশুরবাড়ি।" সাধারণ সামাজিকের সঙ্গে আম্বানির জীবনদর্শনের পার্থক্য ঠিক কতটা লেখকের এই উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। অদ্ভুত এই জীবনদর্শনের পরিণাম স্বরূপ আম্বানিকে ভোগ করতে হয়েছে প্রকৃতির অনিবার্য আঘাত। শরীরের শক্তি ও মনের জোর কোনো কিছুই চিরস্থায়ী না। একটা সময় পর মানুষ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়। প্রকৃতির নিয়মে তখন মনের ও শরীরের দুর্বলতাকে ঢেকে দিতে পারে একমাত্র পারিবারিক জীবন। এই সত্যকে আম্বানি স্বীকার করেনি। তাই আজো সি সাধারণ সামাজিকের জীবন অপেক্ষা উদ্দাম সৈনিক জীবন তার কাছে বেশি বড় আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। এক সময় শরীরের ঘর থেকে শক্তি নিঃশেষ হতে শুরু করে। যে যুদ্ধক্ষেত্রকে নিজের পরম প্রিয় বলে সে মনে করত, সেই যুদ্ধক্ষেত্রই তাকে চূড়ান্তভাবে আঘাত করে- "যুদ্ধভূমিতে দুজনের মধ্যে জড়িয়ে ধরা মেশিনগান হাতে লড়তে লড়তে সে গুলিবিদ্ধ হল। মাস কয়েক হাসপাতালে রইল। তারপর ডাক্তারেরা বলল যে সে আর চাকরি করতে পারবে না, কারণ সে আর সোজা হয়ে 'অ্যাটেনশনে' দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।" এখন সে আর সৈনিকের উপযোগী নয়। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হ

পূর্বের জীবনে। এখন আম্মাণির কাছে নতুন কিছু পাওয়ার নেই, এমনকি দেওয়ার মতোও কিছু নেই। শরীর ও মনের দিক দিয়ে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া আম্মাণি নিজের পুরনো জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তারপর উপলব্ধি করে বিশ্বসংসারে এই মুহূর্তে তার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। নেই তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা কোনো আয়ত চোখ বা কিছু মানুষের দুরুদুরু হৃদয়। বৃহত্তর মানব সভ্যতার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আম্মাণি আজ নিতান্তই একা—"ওর আসার অপেক্ষা করার বা ওকে নিয়ে আনন্দ করার কেউ নেই।" দিনের বেলার কোনো এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন তাকে তার পুরনো জীবনে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেও সে আজ নিতান্ত উদভ্রান্ত পথিক মাত্র—"এরপর সে তার কাঁধিক ব্যাগ ঘাড়ে করে গাঁয়ে ঢুকে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালো সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো জায়গায় বেড়ানোর মতো।" সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আম্মাণিকে তার বস্তির লোকজন চিনতেও পারেনা। পরিশেষে মাসতুতো বোনের স্বামীর নাম করে তাকে অনেক কিছু বলতে হয়—"তখনই আম্মাণির মনে পড়ল তার মাসতুতো বোন কাশাদুর কথা। কাশাদুর বর চক্রপাণির নাম উচ্চারণ করে বলল, সে বাইরে থেকে এসেছে ওদের খোঁজে।" নিজের গ্রামে যখন কাউকে অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হতে হয় তখন বোঝা যায় সেই মানুষের পরিচিতি শূন্য ঠিক কতটা। আম্মাণির ক্ষেত্রে তার বিবর্ণ পরিচয়ও সঠিক পথ দেখাতে পারে না। জানতে পারে তার মাসতুতো বোন থাকে শহরে। তার কাছে গিয়ে সাময়িক স্বস্তি পাওয়ার উপায়ও নেই।

যৌবনের উদ্দীপনা জীবনের রুক্ষ ভূমিতে শুকনো হওয়ার পর একটা সময় আম্মাণি নিজের কৃতকর্মের পরিণতি বুঝতে পারে। পুরনো জায়গায় ফেরত আসার পরও যখন দেখে তার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই তখন উপলব্ধি করে জীবনের স্বর্ণালী দিনগুলো কতটা অবহেলায় সে নষ্ট করেছে। নিজের পুরনো বস্তিতে ফেরার পর আম্মাণি ভুলের পরিণতি নিজের চোখে উপলব্ধি করেছে। এই নিতান্ত একা জীবন অপেক্ষা তার মৃত্যুও তার কাছে বেশি আপন মনে হচ্ছে—"সে এখন ভাবে, সে যুদ্ধে মরে গেলে কত ভালো হত। এখন কে আছে তার জন্য? কার খাতিরে সে বেঁচে থাকবে? তার পকেটে কয়েকশো টাকা আছে। তা দিয়ে সে কী করবে?" একজন প্রবীণ সৈনিকের এই পরিণতি আমাদের অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। কেন এমন হলো? এর উত্তরও আম্মাণি নিজেই উপলব্ধি করেছে।

আলোচনার প্রথমদিকে আমরা বলেছিলাম এই বিশ্বপ্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। নিয়মকে অগ্রাহ্য করলে পরিণাম ভোগ করতেই হবে। আম্মাণির ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। যে সময় তার উচিত ছিল জীবনকে ভালোবেসে, জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা; সেই সময় আম্মাণি ভুল পথে যাত্রা করেছে। আর সেই ভুলের পরিণামস্বরূপ বিশ্বসংসারে সে একা। এই নিঃসীম একাকিত্ব কারো সাথে ভাগ করে নেওয়ার উপায় তার নেই। শুধু মনখারাপের কষ্ট আর সে ভ্রমে বাসের পথে। ট্রেন থেকে নেমে নিজের বস্তির বাড়ীতে নিতান্ত একা

উদভ্রান্ত আম্মাণি অপেক্ষা করছিল একটি পরিচিত মুখের। কিন্তু তেমন কাঙ্ক্ষিত কোনো মুখের সন্ধান সে পায়নি। এরই মাঝে বস্তির দিক থেকে বেরিয়ে আসা এক গরুর গাড়ির ভেতর থেকে উদ্দাম উত্তাল যুবতীর হাস্যোজ্জ্বল কলকাকলি আম্মাণিকে জীবনের অনেক হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিকে মনে করিয়ে দেয়। যৌবনের মধুর দিনগুলিতে সে নিতান্ত অবহেলায় সেই অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে দূরে ফেলে দিয়েছিল। তখন সে ভাবেনি শরীরের ঘরে যৌবনের উদ্দীপনা চিরস্থায়ী নয়। যৌবনের সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর জীবনকে কখনোই আর পুরানো আলোয় আলোকিত করা সম্ভব নয়। এখন পড়ন্ত বেলায় পৌঁছে আম্মাণি নিজের কৃতকর্মের অনুভূতি বড্ড তার অনুভব করে—"হুঁ, আমি তাকে অগ্রাহ্য করে দৌড়েছিলাম...তার দাম তখন বুঝিনি...যদিও জাতের নামে, সম্প্রদায়ের নামে মানুষজন আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে কিন্তু ঈশ্বর সবাইকে সমান ভাবে যৌবন দান করেছেন। সেটাকে আমি লাথি মেরে ছুটে পালাচ্ছিলাম। তখন বুঝিনি যৌবনও আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।" জীবনের পড়ন্ত সময়ের গুরুত্ব কতটা আম্মাণির পরিণতিকে সামনে রেখে গল্পকার পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতি ও মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক যে সম্পর্ক তার সুস্থতা অনেকটাই শর্ত সাপেক্ষ। যেখানেই শর্তের বিচ্যুতি সেখানেই পরিণতি মর্মান্তিক। আম্মাণির জীবন এক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের কাছে উদাহরণস্বরূপ হতে পারে।

'বিকেল বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন' গল্পের আর একটি দিক বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামাজিক স্তরে বর্ণবিশেষে মানুষের জীবনকে কতটা বিভক্ত করে তোলে তার নির্মম ছবি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। আম্মাণি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গল্পকার শুরু করেছিলেন তার বক্তব্য বিষয়, পরবর্তীতে তাকেই অবলম্বন করে তিনি দেখিয়েছেন মানব সভ্যতার চরম লজ্জাজনক ইতিহাসের ছবি। মানুষের প্রথম পরিচয় অবশ্যই মানুষ। মায়ের গর্ভ থেকে শিশু যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার শরীরে লেখা থাকে না সে হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রিস্টান, না জৈন, না বৌদ্ধ বা আরো আরো কিছু। লেখা থাকে না সে কতটা ধনী বা কতটা দরিদ্র। লেখা থাকে না তার বিশেষ কোনো পদবির কথা। কিন্তু পরবর্তীতে ধর্ম, শ্রেণি, বর্ণ ইত্যাদি নানা মাত্রায় মানুষ বিভাজিত হয়ে যায়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের এর থেকে বড় লজ্জা বোধহয় আর কিছু নেই। যুগে যুগে বহু মনীষী, কবি-সাহিত্যিক সকলকে সাম্যের শিক্ষা দিয়েছেন। সবার উপরে মানুষ সত্য। মানুষকে অবহেলা করে কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। অথচ মানবসমাজ এই শিক্ষা জীবনের ক্ষেত্রে সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারেনি।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা পৌঁছেছি একবিংশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতিসহ মানুষের জীবন বর্তমানে প্রযুক্তির বেড়াজালে, প্রযুক্তির সার্বিক আবহাওয়ায় আবদ্ধ। অথচ এতপরও মানুষের শেষ পরিচয় মানুষ না, পরিচয় বলা যায় মানুষ অপেক্ষা মানুষের বিকল্প পরিচয়ই শেষ কথা। অর্থগত বৈষম্য, জাতিগত

বৈষম্য, সর্বোপরি শ্রেণিগত বৈষম্যে আজও মানবসমাজ হারাতে বসে বিভাজিত। মানুষে মানুষে এইরকম শ্রেণি বিভাজন ও তার মর্মান্তিক পরিণামের চরম নিদর্শন আমাদের আলোচ্য গল্পটি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হওয়ার পর আম্বাণি গ্রামে ফিরেছিল সুস্থতার লক্ষ্যে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সুস্থতা সে পায়নি। শরীর ও মনের দিক দিয়ে বিধ্বস্ত আম্বাণি যখন গ্রাম থেকে আবারও অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়ায় তখন সেই একই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পরিচিত হয় এক রুগ্ণ অসহায় মহিলার সঙ্গে, কোলে এক শিশু কন্যা। রোগ ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় মহিলা তখন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। গল্পকার মহিলাটির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—"আম্বাণি তাকে খুঁটিয়ে দেখল। চেহারা দেখে মনে হল একজন ব্রাহ্মণঘরের যুবতী বিধবা। অনেকদিন অনাহারে ভুগে তার দেহ কাঁকরা হয়ে গেছে। মনে হল যেন একটা মানুষের কঙ্কালই প্রাণ নিয়ে ধুঁকছে। বোঝা যাচ্ছে প্রাণটা গলার গহ্বর থেকে বেরোবার জন্য ছটফট করছে।" এই হতশ্রীর অসহায় মহিলাকে দেখে আম্বাণির মনে করুণার উদ্রেক হয়। বোঝার চেষ্টা করে এমন পরিণতির কারণ কী।

পরিচয়ের প্রথম পর্বে আম্বাণি মহিলাটির এই পরিণামের সঠিক কারণ অনুধাবন করতে পারেনি। একটা সময় ট্রেনে টিকিট কালেক্টর আসে এবং সেই মহিলার কাছে টিকিট দাবি করে। কিন্তু তার কাছে যথাসময় টিকিট ছিল না। ফলে টিকিট কালেক্টর জানিয়ে দেন তার সিদ্ধান্ত। মহিলাকে নেমে যেতে হবে পরের স্টেশনেই। এবার আম্বাণি জীবনের প্রশ্নে আর দ্বিতীয় ভুল করে না। টিকিট কালেক্টরকে প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে এই মহিলার জন্য টিকিট সংগ্রহ করে সে। তারপর স্টেশন থেকে দুধ কিনে সেই মহিলা ও তার শিশুকে দুধ খাওয়ায়। পরম স্নেহে অসহায় বাচ্চাটির জন্য কিনে আনে খেলনা। খেলনা পেয়ে এই নিতান্ত অবহেলিত বাচ্চা আম্বাণির সঙ্গে খেলতে শুরু করে—"খিদে মেটার আনন্দে এবং খেলনা খেলার খুশিতে বাচ্চাটি অচেনা মানুষের কোলে কখনো মাথা গোঁজে, কখনো চিবুক ধরে দোলায় টানে। দেখে মা মুচকি হাসে।" দুধ ও রুটি খেয়ে কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর এই মহিলার সঙ্গে আম্বাণির কথাবার্তা শুরু হয়। জানতে পারে পবিত্র ব্রাহ্মণ ঘরের এই মহিলা সুস্থভাবে কখনোই তার সমাজে বাঁচতে পারেনি। যক্ষ্মায় স্বামী মারা যাওয়ার পর তার দায়িত্বভার কেউ গ্রহণ করেনি, অথচ সমাজের অনিবার্য নিয়ম শ্রেণিভেদের কঠোর রীতি পালন করতে গিয়ে মহিলাটি দিনে দিনে শেষ হয়েছে। তার উক্তি থেকে বোঝা যায় সামাজিক জীবনে ছোঁয়াছুঁয়ির দৃঢ়তা কত মারাত্মক ছিল—"আপনি কে আমি জানি না। আপনি আমাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দেখে দয়া করে দুধ এনে দিলেন, আমিও তা খেলাম। এটা কি আমি সমাজের লোকেদের সামনে করতে পারতাম বা করতাম? বলতাম "সরে যাও, সরে যাও" তফাতেই থাকতাম। এর কারণটা কী? কারণটা হল, ব্রাহ্মণে কী বলবে, এই ভয়। এই ভয়টা সকলের আছে।" সামাজিক ক্ষেত্রে এই হল ভারতবর্ষের আসল সংকট। মানুষ ও ধর্মের পারস্পরিক টানাপোড়েনে আমরা মানুষকে মূল্য দিতে পারিনি।

ফলত ধর্মের কঠোর নিয়মের বাঁধনে মানবাত্মা লাঞ্ছিত হয়েছে যুগে যুগে। সভ্যতার এই চরম উন্নতির যুগে পৌঁছেও আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি সেই অন্ধকার থেকে, গল্পকার সভ্যতার এই চরম লজ্জার ছবিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর গল্পে।

এখন প্রশ্ন হল এই অন্ধকারময় লজ্জার ইতিহাস থেকে উত্তরণের পথ কী? সে উত্তরও গল্পকার দিয়েছেন তাঁর গল্প কাহিনিতে। মানুষই সব ক্ষেত্রে সব সমস্যার শেষ কথা বলে। সামাজিক সংকট মোচনে রুখে দাঁড়াতে হয় মানুষকেই। নিম্ন মর্যাদার সাধারণ মানুষের জীবনকে সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে বেঁধে রাখা হয়েছে বহুকালাবধি। এখান থেকে প্রতিবাদী অবস্থান নিতে হবে মানুষকেই। গল্পকার তাঁর বিদ্রোহী নায়িকাকেও দাঁড় করিয়েছেন সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধ ভূমিতে। এমন সে সমাজকে গ্রাহ্য করেনা, নিয়মকে গ্রাহ্য করে না, কোনো বন্ধনও স্বীকার করে না।... বলেছে, "আপনি বলতে পারেন, এত কথা বলছ কিন্তু তুমি এই সব আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিজে কিছু করেছ? হ্যাঁ, আমি করিনি, তা করার মতো আমাকে মানুষ করা হয়নি ...কিন্তু তেমন কিছু এখন করব...হাঁ, তা করব যাতে আমি যা ভোগ করেছি সেটা যেন আমার মেয়ে না ভোগে।" যক্ষারোগে আক্রান্ত এই মহিলা এরপর আর বেশিদিন বেঁচে থাকেনি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে তার চরম সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে। নিজে ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হয়েও আম্মাশির জাত পরিচয় জানার অপেক্ষা না করে একমাত্র সন্তানকে আম্মাশির হাতে তুলে দিয়েছে। নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে এই অসহায় মা কোনোরকম সামাজিক শ্রেণিবিভাজনের তোয়াক্কা করেনি। সে ধর্ম ও সমাজ অপেক্ষা জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সর্বাগ্রে। বলেছে—"আপনার অন্যান্য সন্তানের মতো একেও মানুষ করবেন...তা হলে তার জীবন ভালোই হবে বলে আমার বিশ্বাস...করবেন তো আইয়া?" কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মহিলাটি মারা যায়, তবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে জানিয়ে যায় জাতি, ধর্ম, ধর্মসহ যা কিছু সামাজিক শ্রেণিভেদ তা কোনোটাই মানুষের জন্য উপকারে আসে না। মানুষের বেঁচে থাকা উচিত মানুষ হিসাবেই। জাতিগত শ্রেণিবিভাজন সভ্যতাকে কখনোই সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

জাতিবিদ্বেষের এই হেন পরিণতি আম্মাশিও তার জীবনে দেখেছে কৈশোরের দিনগুলোতে। সমাজের অত্যাচার ও উঁচু জাতের অবহেলার শিকার শেষ হওয়ায় সংসার জীবন অপেক্ষা সৈনিকের জীবনকে সে বেছে নিয়েছিল সামাজিক অবহেলার কারণেই—"পচে যাওয়া ভারতীয় সমাজের দ্বারা বিকৃত তার জাতের জীবনের দৈন্যকে ঘৃণা করেই সে তার আঠারো বছর বয়সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে সাগরপারে যাত্রা করার সুযোগ লাভ করেছিল।" তবে এই পর্বে আম্মাশি জীবনের প্রশ্নে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি, বরং হেরে যাওয়া সৈনিকের মত মুখ লুকিয়ে আশ্রয় খুঁজে ছিল অন্য কোথাও—"এ জীবনে তার জাতের জন্য অপমানিত হওয়ার বিপদ ছিল না।" জীবনের পড়ন্ত বেলায় পৌঁছে আম্মাশি প্রথম যৌবনের ভুলটি

দ্বিতীয়বার আর করে না। অসহায় মহিলার জীবনের চরম দুঃখের কথা নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করার পর সেও প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। অন্য জাতের শিশু সন্তানকে নিজের কোলে আঁকড়ে ধরতে আজ আর তার কোনো বাধা নেই। সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে বরণ করে নিয়েছে অসহায় সেই মানব শিশুকে।

সুস্থ সমাজ কখনই হিংসা, বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সমাজ গঠনের মূলমন্ত্র অবশ্যই প্রেম ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার। সভ্যতার এক উন্নত অবস্থায় পৌঁছেও এই সাধারণ শিক্ষাটা অর্জন করতে পারেনি বর্তমান সমাজ। ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তের খোঁজ করার সময় বা রক্ত নেওয়ার সময় রক্তদাতার জাতের খোঁজ কেউ করেনা, অথচ ভিড়ের মধ্যে পাশে দাঁড়ানো মানুষকে মানুষ বলে বিবেচনা করতে সকলে প্রস্তুত নয়। এই হিংস্র মনোভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করা দরকার। এক্ষেত্রে পাথেয় হতে পারে 'দিনের বেলা একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন' গল্পটির সার্বিক পটভূমি। ব্রাহ্মণ ঘরের অসহায় মাতৃহারা সন্তান এখানে আশ্রয় পেয়েছে নিম্ন জাতের আম্মাশির কাছে। উভয়ের মিলন মধুর ছবি বড়ই তৃপ্তিদায়ক। নিম্ন জাতের আম্মাশি উচ্চ জাতের শিশুকে কোলে তুলতে দ্বিধা করেনি। আবার আম্মাশির কোলে ব্রাহ্মণ শিশুর নিরাপদ নিদ্রাও কোনো দ্বিধা তৈরি হয়নি শিশুটির বাবা বা পাঠকের মনে। গল্পকার যেন দেখাতে চেয়েছেন মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক শ্রেণিভেদ একান্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় নয়। আম্মাশির সঙ্গে ব্রাহ্মণ শিশুর এই মিলন দৃশ্য পরবর্তী সমাজকে, সভ্যতাকে মানুষকে মানুষ বলে বিবেচনা করার শিক্ষাই পৌঁছে দেয়। বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণসহ অন্যান্য উচ্চ জাতের মানুষের সঙ্গে নিম্ন জাতের মানুষের আত্মিক মিলনের ছবি প্রায় দুষ্প্রাপ্য। যদিও তেমনই হওয়া উচিত আমাদের সামাজিক শিক্ষা। বিখ্যাত বাঙালি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার 'সহমরণ' কবিতায় অসামান্য এক প্রেমমিলনের ছবি এঁকেছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেছে এক দরিদ্র মুসলমান জেলে। তাদের পরবর্তী জীবনও ভরে উঠেছে আশা আনন্দের অনেক কোলাহলে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সহমরণ' কবিতা বা শতপর্ণি জয়কাঞ্চন এর 'দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন' ছোটগল্প এই শিক্ষাই পরবর্তী সমাজকে পৌঁছে দেয় যে, দুইজন মানুষের প্রকৃত কোনো ভেদাভেদ নেই। যেখানে গণ্ডি চরম শক্ত সেখানেই মানব আত্মা চূড়ান্ত লাঞ্ছিত। তাই শক্ত গণ্ডিকে শিথিল করাই সুস্থ মানবাত্মার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

- উদ্ধৃত গল্পাংশগুলি মুখোপাধ্যায় রামকুমার, ভারতজোড়া গল্পকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০২২ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

DOI : 10.5281/zenodo.10896401

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Published By : Ashis Roy, Chandlberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Ph : 9804923182, 8250595647

Email : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

Ebong Prantik

এবং প্রান্তিক

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৯, মে ২০২৫

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor : 8.311

Vol. 12th Issue 29th, May, 2025

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor : 8.311

[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)]

Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and

Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,

Vol. 12th Issue 29th, 12th May, 2025, Rs. 850/-

E-mail : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১২ তম বর্ষ ও ২৯ তম সংখ্যা

১২ মে, ২০২৫

ISSN : 2582-3841 (Online)

2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিস্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২

সৌরভ বর্মন

ফোন - ৮২৫০৫১০৬৪৭

মুদ্রণ

অনন্যা

বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

ফোন - ৯১৬৩৯৫১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথের ভাষাভাবনা ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান

শিউলি বসাক ১১

মধ্যযুগে বাংলা ভাগবত অনুবাদের ধারায় রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ও দুঃখী শ্যামদাস

মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ ১৭

ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্র ভাবনা

নিবেদিতা গুহ ২৬

নীরব অভিব্যক্তির শিল্পিত মাধুর্য : দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল

ঈশা আহমেদ ৩২

বাংলা ধাঁধায় বিজ্ঞানের উপাদান

শান্তনু ভট্টাচার্য ৪০

'অলীক মানুষ' : সত্তার বিস্তারের বয়ান

লক্ষ্মী নাথ ৪৭

সঙ্গীতের পরম্পরায় : সত্যজিতের সাধনা

সঞ্জয় গড়াই ৫৪

জ্যোতির্ময়ী দেবীর নির্বাচিত উপন্যাসে নারী-পরিসর

প্রিয়াঙ্কা দে ৫৮

রাসেলীয় দৃষ্টিতে 'শব্দ' : একটি অনুধ্যান

কৃষ্ণা দত্ত ৬৩

অপারেশন বর্গার প্রেক্ষাপটে অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' : লোকসংস্কার থেকে জনচেতনার উত্তরণ

সুতপা পাল ৭০

গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ : মানবীবিদ্যা চর্চা ও বিশ্লেষণের অভিনবত্ব

নূর-ই-নুসরাত ৭৬

সমাজের শরীর ও শরীরের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ স্বপ্নময় চক্রবর্তীর হলদে গোলাপ

অভিজিৎ ভট্টাচার্য ৮৪

একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিকের চোখে প্রথা ও সংস্কারের প্রতিফলন : বাণী বসুর খারাপ ছেলে

শ্রাবণী কুন্ডু ৮৯

চড়ক উৎসব : বাংলার লোকজ সংস্কৃতির এক রঙিন উৎসব

অরিন্দম হালদার ৯৪

বঙ্কিম প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদ

সুপর্ণা কুন্ডু মাইতী ১০২

বাণী বসুর 'অক্ষবধূ' উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্ক

অর্পিতা মল্লিক ১১১

মন্দাক্রান্তা সেনের একবিংশ শতকের কবিতায় নারীর জীবনকথা

এ.টি.এম. সানাউল্লা ১১৯

ক্লাসিক্যাল জীবনানন্দ ও পপুলার নজরুল : একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

কালীপদ বর্মন ১২৮

মতুয়াধর্মের অগ্রগামী শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর
মেঘুই দাস ১৩৪
বাংলা কবি জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে জীবনানন্দ দাশ : প্রসঙ্গ
আনিসুল হকের 'এতদিন কোথায় ছিলেন'
দিব্যেন্দু দে ১৪১
শ্রী মা সারদাদেবী ও নারীশক্তি
নীলেন্দু দাস ১৪৭
মোর্তাজিয়া নন্দীর শিল্পরীতি : সৌন্দর্যানুভূতি ও সূক্ষ্ম যৌনচেতনার
আলোকে অঙ্কিত শিল্পসৃষ্টি
শম্ভু হাজারী ১৫১
আদিবাসী কবিদের কবিতায় আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের সংকট
মকর মুর্মু ১৫৬
সময়ের একাদশী : একটি নির্দিষ্ট কালের সমাজদর্পণ
মৌসুমী দাস ১৬০
জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে (নির্বাচিত) মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিফলন
মল্লিকা ঘোষ ১৬৬
জনপ্রতীত বাংলা শ্রেণির নামপ্রয়োগ-রীতি
মিঠুন মিত্র
অনিন্দিতা দাস ১৭৪
শক্তিপদ রাজগুরুর 'মণিবেগম' : উপন্যাসের আধারে ইতিহাসের নবনির্মাণ
শিল্পী বক্সী ১৮৪
বিদ্যাসাগরের রসবোধ
রুদ্রেশ দাস ১৯০
বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাভাবনা : বর্তমান উপযোগিতা
সংকর্ষণ মণ্ডল ১৯৭
'রবীন্দ্রনাথ ও লাইব্রেরি-ভাবনার নবদিগন্ত'
দীপঙ্কর সেনাপতি ২০৪
বাঙালির সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
দিব্যশ্রী প্রসাদ ঘোষ ২০৮
শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পুরাণ ও মহাকাব্যিক চরিত্রের অনুষঙ্গ
পীযূষ পোদ্দার ২১৭
নতুন মানবিক সমাজ গঠনে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ভূমিকা : শ্রী অরবিন্দের
দর্শনভিত্তিক চিন্তাধারা
প্রিয়াঙ্কা নস্কর ২২৬
বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
প্রেম কুমার মণ্ডল ২৩৫
পরিবেশ রক্ষার্থে মানবেতর প্রাণীদের প্রতি মানবের নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ
প্রতিমা রানী ২৪০
পুরাতত্ত্ব ও মন্দির : পুরাকীর্তির আলোয় পাড়া
রঞ্জিত মণ্ডল ২৪৮

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের মুসলিম নীতিশাস্ত্র ও বাংলা সাহিত্য
মহ আরিফ আলি ২৫৩
ইতিহাসের আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল বঙ্গসমাজে
সতীদাহ প্রথা : একটি সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান
রাহুল দে ২৬০
জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কলহ থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা : একটি
ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (১৯২১-১৯৩৯)
শান্তনু সরকার ২৬৬
ভবভূতির উত্তররামচরিত-এ 'ছায়া-সীতা'র নাটকীয় তাৎপর্য
দেবাশিস রায় ২৭৩
তিলোত্তমা মজুমদারের কথাসাহিত্যে অবদমিত নারীর মনস্তত্ত্ব
সীমা মণ্ডল ২৭৭
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে সমাজবিযুক্ত মুসলমানের চিত্র
(নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে)
বৈশাখী ঘোষ চৌধুরী ২৮৭
সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসে ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস, সাম্যবাদী
আদর্শ ও মুক্তির লড়াই
সঙ্গীতা পাঁজা ২৯৫
একশো দিনের কাজে নিয়োজিত সাগরদীঘির মহিলাদের সামাজিক,
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন
সৌরভ রানা ৩০২
উচ্চশিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের সামাজিক অবস্থা ও বাস্তব চিত্র
অভিজিৎ কুমার সিংহ ৩০৬
The Role of Peace Education in Shaping Young Minds
Dola Sarkar ৩১২
Implementation of Vedic Philosophy in Indian Education System
Prasenjit Das ৩১৫
From Arakan to Exile : A Historical Analysis of Rohingya
Migration Patterns from the 19th Century to the Present
Samina Khatun
Taslima Aktar ৩২১
Pseudo-Secularism : A Hindu Nationalist Perspective on the
Indian National Congress
Sanjay Biswas ৩২৭
National Education Policy : School Education Structure
Sk. Ruby Akhter ৩৩৪
Navigating the Fog of Reason : Kant's Search for Certainty
Souvik Dutta ৩৪০
Impact of flood hazards on fruits and flowers cultivation
in Nadia district
Ujjal Roy ৩৫০

A Study on Student Teachers Attitude Towards ICT in the Teacher Education Programme
Lipika Das
Ripa Mazumder ৩৬১
Environmental ethics and cosmology in Ancient Indian Literature
Monalisa Dutta ৩৭০
The Role of Early Christian Monasticism on the Establishment of Indian Christian Ashrams
Ajoy Ghosh ৩৭৬
The Universal Moral Values and the Teachings of *Bhagavadgita*
Debasree Sadhu ৩৮০
Natural Disasters and Colonial Response : Scientific Interventions in Floods and Famines in Medinipur
Dipankar Das ৩৮৫
Upanisadic Influence in the Modern Indian Society
Ram Pada Roy ৩৯৩
The British Army Diet in Colonial India : Nutritional Policies for Soldiers and Their Effects
Sanchari Chaulya
Rinky Behera ৩৯৯
Empowering Tribal Women in Junglemahal : Achieving Social and Financial Self-Reliance through Forest Resource Utilization
Sanchayita Sasmal ৪১০
The Burden of the Past : Intergenerational Trauma and Patriarchal Oppression in 'The Dark Holds No Terrors'
Sangita Halder ৪১৮
Exploring Teacher Perspectives on NEP 2020 in Indian Higher Education
Sital Sing ৪২৪
Concept of Yogāṅga Svādhyāya in the Indian Knowledge Tradition in the light of Manusmṛti
Santosh Mandal ৪৩০
Communication as Resistance : A Critical Analysis of Badal Sircar's Third Theatre
Nazrul Ahmed Zamader
Santwan Chattopadhyay ৪৩৮
AI Integration in Teacher Education in the Light of NEP-2020
Subhajit Saha ৪৪৬

মন্দাক্রান্তা সেনের একবিংশ শতকের কবিতায় নারীর জীবনকথা

এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ

সারসংক্ষেপ: একবিংশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতার জগতে মন্দাক্রান্তা সেন একজন বিশেষ কবি ব্যক্তিত্ব। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টালিগঞ্জে তাঁর জন্ম। শিক্ষাজীবন যথেষ্ট উজ্জ্বল হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত সাহিত্যচর্চাতেই নিজেকে সর্বাংশে নিয়োজিত করেন। বিংশ শতকে তাঁর লেখা শুরু এবং একবিংশ শতকের প্রথম পর্বেই তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। বর্তমানেও তাঁর সাহিত্যচর্চা সমানভাবে বহমান।

অন্যান্য মহিলা কবিদের মতো মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতাতেও মহিলাদের জীবনকথা বিশেষভাবে জায়গা পেয়েছে। সমাজের সব স্তরের নারীদের কথা তাঁর কবিতায় জায়গা পেয়েছে। এসেছে গৃহবধূ, যুবতি, তরুণী, বিধবা, বেশ্যা, ধর্ষিতা প্রভৃতি নানা শ্রেণির নারীর কথা। সমাজের সব স্তরের নারীদের জীবনের যন্ত্রণাকে কবি ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নারী হৃদয়ে ভালোবাসার প্রতিফলন কেমন, পুরুষকে নারী কতটা ভালোবাসে আবার কতটা ঘৃণা করে, পুরুষের উপরে নারীর আস্থা কতটা, সেই আস্থা ভঙ্গ হলে তারা কতটা কষ্ট পায় এই সব নানা প্রশ্নের উত্তর তাঁর কবিতায় স্পষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন কবিতায় পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন মহিলাদের আশার সাধনা, ভালবাসা, ভালবাসার অপমৃত্যু, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণার কথা। একবিংশ শতকে লেখা তাঁর বিখ্যাত কিছু কাব্য হল 'বাক্য অনাহারে' 'এ সবই রাতের চিহ্ন' 'হৃদপুরাণ' 'অন্যসূত্র হত্যাসূত্র' ইত্যাদি।

কবিতার মধ্যে দিয়ে নারী জীবনের সংকট ও সম্ভাবনাকে ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি। খুব সহজ সাধারণ ভাষা ও ছন্দে তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। কবিতার ছন্দ নিয়ে তাঁর চর্চা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে লেখা মন্দাক্রান্তা সেনের কাব্যগ্রন্থে নারী জীবনের প্রতিচ্ছবি কতটা আছে তা দেখার চেষ্টা করব। একই সঙ্গে দেখব এই কাজে তিনি কতটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
সূচক শব্দ: নারীর প্রেম, নারী শোষণ, নারীর অসহায়তা, নারীর মাতৃত্ব, নারীর স্বপ্ন সাধনা।

মূল আলোচনা:

একবিংশ শতকের প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে মন্দাক্রান্তা সেন অন্যতম। আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁদের হাতে বিশেষ নির্মিতি পেয়েছে তিনি তাঁদের একজন। ১৯৭২ সালে কলকাতার টালিগঞ্জে তাঁর জন্ম। শিক্ষাজীবন শুরু হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্মেন্ট গার্লস হাই স্কুলে। এই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে বাংলায় ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর পড়াশুনার পথ পাল্টে নেন কবি। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে এম.বি.বি.এস. পড়তে শুরু করেন। যদিও এই পড়াশোনা তিনি শেষ করতে পারেননি। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে মন্দাক্রান্তা সরাসরি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপর সাহিত্য চর্চাই হয় তাঁর জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। সাহিত্য জীবনে লিখেছেন অসংখ্য

কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প। এখনও চলছে তাঁর সাহিত্য সাধনা। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমী পেয়েছেন ভুবিনী আওয়ার্ড, কৃত্তিবাস পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার। একবিংশ শতাব্দীতে লেখা তাঁর বিখ্যাত কিছু কাব্যগ্রন্থ হল 'বলো অনাহতে', 'স্বপ্নপুরাণ', 'এ সবই রাতের চিহ্ন', 'বাসিকদের গাঁথা হাড়', 'জলসুর হতাসুর', 'আত্মহত্যা রেখেছি ফুলঝুরি', 'পরিতৃপ্ত সাজো বলা মানা', 'এখন নিশ্বাস আয়োজন' প্রভৃতি। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সক্রিয়মানুষ হিসেবেও মন্দাক্রান্তা সেনের মধ্যে সামাজিক ও মানবিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাওয়ার কিছু বছর পর তিনি তা প্রত্যাখান করেন। উত্তর প্রদেশের দাদরি মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে তিনি এই পুরস্কার ফেরত দিয়েছিলেন। পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রকট হয়। এমনিতে কবি শিল্পীদের সবচেয়ে বেশি পরিচয় হৃদয়ের মধ্যে। শিল্পী-সাহিত্যিকরা সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এই সাধারণ সত্য মন্দাক্রান্তা নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন। যদিও বর্তমানের সব শিল্পীরা সামাজিক ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন না, বা করছেন না। তবে মন্দাক্রান্তা সেন এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। একদিকে কবি অন্যদিকে সামাজিক জীব এই উভয় পরিচয় তিনি সমানভাবে বজায় রেখেছেন।

মন্দাক্রান্তা বিশ শতকের নব্বই এর দশকের পর থেকে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। তবে কাব্যজগতে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা একবিংশ শতকে। কবিতার বিষয়ভাবনা, আঙ্গিক, ভাষা ব্যবহার, ছন্দ নির্মাণ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি হিসেবে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। সমাজ ও মানুষের হৃদয়ের গভীরে যেখানেই অসংগতি উপলব্ধি করেছেন, সেখানেই তাঁর কবিতার তীর আছড়ে পড়েছে। জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন কবিতাকেও সেই ভাবে সাজিয়েছেন। জীবনমুখী কবিতা মন্দাক্রান্তার কবি প্রতিভার অন্যতম দিক। এই সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বলেছেন--

"কবির কবিতায় প্রবাহিত হয়ে উঠেছে জীবনের স্পন্দন। তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করেছেন এবং তাকেই একেবারে সাদামাটা ভাবে অথচ সাবলীলভাবে পরিবেশন করেছেন।"[৯]

বাংলা সাহিত্যে নারীদের জীবনকথা অত্যন্ত পরিচিত একটি বিষয়। সাহিত্যের প্রায় সূচনালগ্ন থেকে মহিলারাও সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছেন সমানভাবে। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্য মানেই তা মানুষের জীবনের ইতিহাস। মানুষের প্রাত্যহিকতা, তাদের সুখদুঃখ, জীবনযন্ত্রণা জীবনযুদ্ধের কথাই সাহিত্যে বেশি করে জায়গা পায়। অন্য সাহিত্যে মহিলাদের জীবনের প্রক্ষেপ যতটা খুবই স্বাভাবিক আর তেমনটা হয়েছেও। বাংলা সাহিত্যের একেবারে প্রথম পর্বে লেখা চর্যাপদেও আমরা দেখেছি নারী জীবনের কথা। সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষরা নিম্ন শ্রেণির মহিলাদের দেহ উপভোগ করছে। গ্রামের বাইরে ডোমনের বসবাস, তাদের গ্রামে প্রবেশের অধিকার নেই। কিন্তু উচ্চশ্রেণির পুরুষরা এইসব নারীদের শরীর উপভোগ করতে দ্বিধা করেনি। বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন ডোম নারীর শরীরে কোনো দোষ নেই, যত দোষ তার জন্মে। চর্যাপদে নারী জীবনের এই যে প্রক্ষেপ তার ধারা প্রাচীন যুগের সীমা অতিক্রম করে মধ্যযুগের সাহিত্যেও সমানভাবে বহমান থেকেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী জীবনের প্রক্ষেপ ঘটেছে মূলত পুরুষ কবিদের মাধ্যমে। এই পর্বে নারী কবিদের সেইভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। বা তাঁরা সাহিত্যচর্চা করেননি, করলেও তার গরিষ্ঠ তা স্বীকৃত হয়নি। এর অনেক রকম সামাজিক কারণ রয়েছে।

এখানে আমরা সেদিক নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব না। আমরা দেখার চেষ্টা করব মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীজীবনের ছবি কোথায় কীভাবে এসেছে। প্রথমেই ধরা যাক মনসামঙ্গল কাব্যের কথা। এখানে বেহুলার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। বেহুলাকে তার স্বামীর জীবন বাঁচানোর জন্য দেবতাদের সামনে উদ্দাম নৃত্য প্রদর্শন করতে হয়েছে। নারীদেহের এই অপমান সেদিনের প্রেক্ষিতে তো বটেই আজকের প্রেক্ষিতেও সর্বাংশে লজ্জাজনক। সেদিনের পুরুষ কবিরা নারীদের সম্মানের আসনেই বসিয়েছিলেন। তাই সতী যাওয়ার ঘটনার প্রতিফলনস্বরূপ তাকে কাব্য কাহিনিতে স্থান দিয়েছেন নিরপেক্ষ ভাবে, কোনোরকম বিকৃত না করে। একইভাবে মহিলাদের জীবন যন্ত্রণার কথা এসেছে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারোমাস্যার মধ্যে দিয়ে সমকালীন গৃহবধূদের জীবনযন্ত্রণা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। আবার লহনা-খুল্লনার সংসারে সতীন যন্ত্রণার ছবি যেভাবে এঁকেছেন তা চিরকালীন হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী জীবনের কথা নানা জায়গায় পাওয়া গেলেও বিশেষভাবে বলতে হয় ধর্মমঙ্গল কাব্যের কানাড়া ও কলিঙ্গার কথা। সমগ্র মধ্যযুগে এইরকম বীরত্বপূর্ণ নারী চরিত্র বিশেষ একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা আগেই বলেছি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মহিলা কবি বিশেষ নেই। কিন্তু এই কালপর্বে মাত্র একজন মহিলা কবিকে আমরা পাই। ইনি হলেন চন্দ্রাবতী। মধ্যযুগের শেষ পর্বে চন্দ্রাবতী লিখেছিলেন রামায়ণ কাব্য। তাঁর কাব্য চন্দ্রাবতী রামায়ণ নামেই পরিচিত। কাব্যটি সমকালীন সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং একমাত্র মহিলা কবিদের লেখা রামায়ণ হিসেবে এই কাব্যের সুনাম রয়েছে।

উনবিংশ শতকে রেনেসাঁসের পর বাংলা কাব্য কবিতার জগতে প্রভূত পরিবর্তন সূচিত হয়। মধ্যযুগের পর্ব শেষ হলে বাংলা কাব্যজগত টপ্পা, তরজা, ঝুমুর ইত্যাদি অশ্লীল গানের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেছে বেশ কিছু বছর। সেখান থেকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যকে মুক্ত করেন এবং বাংলা আধুনিক কবিতার সূচনা হয়। এই সময় থেকে বাঙালি মেয়েরাও কাব্যকাননে তাঁদের চিন্তাশক্তির ছাপ রাখতে শুরু করেন। একের পর এক মহিলা কবির আবির্ভাব হয়। এই পর্বের বিখ্যাত কবি হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তাঁর **'অবরোধ'** কাব্য মেয়েদের জীবনকথার বর্ণনায় সমৃদ্ধ। নিজে ছিলেন সুশিক্ষিতা ও আধুনিক মনস্কা নারী। মেয়েদের অবরুদ্ধ জীবনযাপনের বিরুদ্ধে ও তাদের মানসিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে রোকেয়া চিরকাল সংগ্রাম করে গেছেন। রোকেয়ার পর উনবিংশ শতকে একের পর এক মহিলা কবির আবির্ভাব হয় এবং তাঁরা সাহিত্যের পাতায় মেয়েদের জীবনযন্ত্রণার কথা বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এই পর্বের বিখ্যাত মহিলা কবি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়। স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্যগুলি হল **'বসন্ত উৎসব'** ও **'গাথা'**। বাংলার শান্ত ও নিবিড় প্রকৃতি বর্ণনার মাঝে মাঝে কবিতার মধ্যে মেয়েদের জীবনকথার প্রকাশ আছে। আবার গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যে অনুভূতির সঙ্গে প্রকাশভঙ্গির একটি সহজ সখ্যতা লক্ষ করা যায়। বিধবা সমস্যা এইসব কবিদের কাব্যে বিশেষভাবে ছায়া ফেলেছে। ব্যক্তিগত জীবনে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে কাব্যগুলোতে। বিখ্যাত কাব্য হল **'অশ্রুকণা', 'আভাস', 'অর্ঘ্য'**। উনিশ শতকে মহিলা কবিদের মধ্যে আর একজন বিশেষ ব্যক্তি হলেন মানকুমারী বসু। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ইনি বিধবা হয়েছিলেন। বিধবাদের জীবনযন্ত্রণা তাঁর কাব্যেও বিশেষভাবে ছায়া পেয়েছে। **'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'** ও **'প্রিয়প্রসঙ্গ'** কাব্য দুটি তাঁর কবি প্রতিভার

অন্যতম প্রকাশ। সমকালীন সমাজে নারীদের জীবনের বাস্তব ছবি তাঁর কাব্যে বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ের আর একজন কবি কামিনী রায়। তাঁর কবিতায় গীতিকবিতার ছাপ আছে। তবে সমকালীন অন্যান্য গীতিকবি বিহারীলাল বা অক্ষয় কুমার বড়ালের মতো আবেগপ্রবণ না হলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি যে কবিতাগুলো লিখে গিয়েছেন তা কৃতিত্বের দাবি রাখে। তাঁর বিখ্যাত কাব্য হল **'আলো ও ছায়া'**, **'মাল্য ও নির্মাল্য'**, **'পৌরাণিকী'**, **'গুঞ্জন'**, **'দীপ ও ধূপ'**, **'অশোক সংগীত'** ইত্যাদি। উনবিংশ শতকের এইসব মহিলা কবিদের কাব্যে নারীদের জীবনকথাসহ সমকালীন আরো নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নারী জীবনের কথা এক্ষেত্রে অবশ্যই বেশি করে জায়গা পেয়েছে। সব মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিরা তাঁদের কথাকে ব্যক্ত করেছেন নিজস্ব ঢঙে।

বিংশ শতকের শেষ পর্বে ও একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত মহিলা কবিরা সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সময়ে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য কবি রাজলক্ষ্মী দেবী। **'মহাসাধক'** কাব্য প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর আবির্ভাব। এই সময়ের আর একজন বিখ্যাত কবি কবিতা সিংহ। দেশ, কৃত্তিবাস প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশ পেত। বিখ্যাত কাব্যগুলি হল **'সহজ সুন্দরী'**, **'কবিতা পরমেশ্বরী'**, **'মোমের তাজমহল'** প্রভৃতি। মেয়েদের জীবনযন্ত্রণা ও মেয়েদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচার নিয়ে কবিতা সিংহের হৃদয়ে ছিল গভীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে তাঁর কবিতার মধ্যে। সমকালীন আর একজন বিখ্যাত কবি হলেন তসলিমা নাসরিন। তসলিমা বিদ্রোহী নারী কবি রূপে বিশেষভাবে নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে আমরা সব সময় দেখেছি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করতে এবং সে বিরোধিতার ভাব ও ভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে অন্যদের থেকে আলাদা।

বিশ শতকের শেষ পর্বে ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাব্যগুলি হল **'আমার প্রভুর জন্য'**, **'ভঙ্গি শব্দহীন'**, **'ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম'**, **'উড়ন্ত নামাবলি'**, **'ঐ যে সৌধের চূড়া'**, **'আর, যেটুকু বলা যায়'**। বিশ শতকের শেষ পর্বে ও একবিংশ শতকের প্রথম দিকে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত। যুক্তিবাদী ও কঠোর শব্দের জন্য কবিতার জগতে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতাতেও নারী জীবনের যন্ত্রণা ও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা আছে। সাম্প্রতিককালে কৃষ্ণা বসুর মতো তিনিও সরাসরি নারী নিগ্রহ ও বিদ্রোহের কথা কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁকে নারীবাদী কবি হিসেবেও অভিহিত করা যায়। তাঁর কাব্যগুলি হল **'কথামানবী'**, **'আমরা লাস্য আমরা লড়াই'**, **'দেওয়ালির রাত'**, **'পুরুষকে লেখা চিঠি'**, ইত্যাদি। মন্দাক্রান্তা সেনের আবির্ভাব বিশ শতকের শেষ পর্বে। এখনও মন্দাক্রান্তা সেনের কাব্যচর্চা বহমান। বর্তমান নিবন্ধে আমরা মন্দাক্রান্তা সেনের কাব্যে নারী জীবনের প্রক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হবে একবিংশ শতাব্দীতে লেখা তাঁর কিছু কবিতাকে কেন্দ্র করে।

মন্দাক্রান্তা সেন একজন নারী। মেয়েদের জীবনের নানা বিচিত্র প্রসঙ্গ তার কবিতায় বিশেষভাবে জায়গা পাবে, এটাই স্বাভাবিক। **'বলো অনাহতে'** কাব্যের **'অন্ন'** কবিতায় কবি সমাজের একটি অন্ধকারময় দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের সমাজের কিছু নারী দেহব্যবসা করে জীবিকা উপার্জন করে। খুব সহজ ভাষায় এদেরকে আমরা দেহব্যবসায়ী বলে জানি। একজন নারী কেন দেহব্যবসা করে তার পূর্বাপর বৃত্তান্ত অনুসন্ধান ছাড়াই দেশের

নারীদের গায়ে নষ্ট নারীর তকমা লাগিয়ে দেয় আমাদের সমাজ। বাস্তবটা এমন থাকে যেন এইসব নারীদের হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই। এরা শরীরের সুখ ও টাকার মোহ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই চেনে না। কিন্তু বাস্তবটা কি সেরকমটাই অন্ধকারে মোড়া? সেখানে কি আলোর বিন্দুমাত্ররেখা নেই? এইসব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন কবি আলোচ্য কবিতায়। এই কবিতার সেই নষ্ট মেয়ে বলছে-

"ভিতরে ভিতরে শুধু তোর কাছে যেতে ইচ্ছে করে।
এত পুরুষের কাঁধে হাত রাখি, কেউ তবু
তোর মতো নয়।"

বোঝাই যাচ্ছে এই নষ্ট মেয়েটি কোনো একটা পুরুষকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু তাদের সে ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি। বর্তমানে যে কারণেই হোক তাকে বহু পুরুষের কাছে শরীর বেচতে হয়, বহু পুরুষের কাঁধে হাত রাখতে হয়। তবুও হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসার যে সূক্ষ্ম বিন্দুটি রয়েছে তাকে সে মরতে দেয়নি। হাজার শরীরের স্পর্শেও ভালোবাসার মানুষের বুকে ফেরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে। বোঝাই যাচ্ছে দেহব্যবসায়ী হলেও সে শুধুই দেহের কারবারি নয়। তার হৃদয়েও ভালবাসা আছে, সেও কাউকে ভালবাসে।

কবিতা শেষ পর্বে কবি আরো একটি প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। যারা সুস্থ দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিশ্বাস করে, তারা কি কখনও কোনো দেহব্যবসায়ীকে ভালবাসতে পারবে? দেহব্যবসায়ীকে নিজের প্রেমিকা বলে সম্মান জানাতে পারবে? সত্যি বলতে কী এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এই কবিতায় যে পুরুষের উল্লেখ করেছেন কবি, সেই পুরুষটি দেহব্যবসায়ীকেই ভালোবেসেছে। সেও জানে যে তার প্রেমিকা সতী নয়। তারপরেও সে তাকে ভালোবাসে। ভালবাসার এই মর্মর প্রকাশ নষ্ট মেয়ের মুখ থেকেই আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয় -

"ভিতরে ভিতরে শুধু তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে
যাকে আমি ভালোবাসি।
সে আমাকে মন্দ বলে জানে।"

একজন নারী হয়ে মন্দাক্রান্তা সেন এই কবিতায় পুরুষকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। সাধারণভাবে দেখা যায় নারী কবিরা পুরুষ সমাজকে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ হিসেবেই বিবেচনা করেন। পারস্পরিক সম্মানবোধ অনেক সময়ই রক্ষিত হয় না। পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আক্রোশের সেই করাল রূপ মন্দাক্রান্তা সেনের মধ্যে দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে মন্দাক্রান্তা কিছুটা যেন অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন।

নারী ভাবনার আরো একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় **'হৃদয়পুরাণ'** কাব্যের **'আসান'** কবিতায়। এই কবিতায় এমন একটি গৃহবধূর ছবি আঁকা হয়েছে, যে তার সংসার জীবনে ক্রমাগত নির্যাতিত। দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে একসময় সে ভাবতে শুরু করে-

"দুখকীটি ভেবেছিল রোজ রাতে বিকোনোর চেয়ে
একদিন অন্ধকার বেয়ে
চলে যাবে এই অন্ধকূপ থেকে দূরবর্তী ঘাটে।
এ তার প্রথম ঘাট, নারীজন্ম কেঁদে কেঁদে কাটে..."

সংসার বা গৃহকোণের মধ্যে হয়তো অনেক জটিলতা, অনেক নিষ্পেষণ আছে, তবুও সংসারের বাইরের পরিবেশ তার চেয়েও ভয়ংকর। কবিতার শেষ পর্বে আমরা দেখি সেই মেয়েটি আরো

কিন্তু মানুষের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে এবং তাকে খুন করা হয়েছে। এই কবিতায় পাশাপাশি দুটো ছবি আঁকা হয়েছে। একটা ঘর গৃহস্থালির মধ্যে দুর্গতি নারীর ছবি, অন্যদিকে সংসার পরিবেশের বাইরের পৃথিবী। নারীর জন্য কোনো পৃথিবীই যথেষ্ট নিরাপদ নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নারীকে শেষ পরিণতির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভোগ করা হয়। কিন্তু এখানেই নারীর শোষণ শেষ হচ্ছে না। গৃহকর্ত্রী এই মহিলাটি ঘর ছাড়ার আগে ফেলে গিয়েছিল তার ব্যবহার করা শাড়ি। দেখা যায় সেই সংসারে সেই ঘরে আবার একটি নতুন নারী এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তারই ব্যবহার করা শাড়ি পরিধান করেছে–

"সে ঘরে নতুন মেয়ে, অঙ্গে সেই ফেলে যাওয়া শাড়ি..."

কি ভয়াবহ নারীর শেষ পরিণাম। পৃথিবীর তীব্র লালসা তার নিঃশ্বাসের শেষ বিন্দুটি হরণ করেছে নিমেষে, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে দিয়েছে চরম শারীরিক অত্যাচার। মৃত্যুর পরেও তার লাঞ্ছনার শেষ নেই। যে ঘর সে ফেলে এসেছিল আজ সেই ঘরে জায়গা নিয়েছে আরও একটি মেয়ে। হয়তো এমনটাই ঘটতে থাকবে দিনের পর দিন, হয়তো নতুন মেয়েটি আবার আগের মেয়েটির মতোই অত্যাচারিত হবে। এইসব অত্যাচারের বিচার করবে কে? কে এই পারিবারিক ও সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবিধান করবে? এসব প্রশ্ন সকল সচেতন নাগরিকের মনেই উপস্থিত হবে, কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। এটাই শাশ্বত যে সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে মিশে থাকতে হবে সকল নারী সমাজকে।

'অন্ধপুরাণ' কাব্যের **'লজ্জাবস্ত্র'** কবিতাটিতে বর্তমান সমাজে নারীদের সামাজিক অপমানের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বর্তমান দিনে আমাদের ঘরের মেয়ে মা-বোনেরা রাস্তায় বেরিয়ে কেউ নিরাপদ নয়। যৌবনপ্রাপ্ত সব পুরুষই নারীদের উপভোগ করতে চায়। উপভোগের লালসা এতটাই নগ্ন যে কোনো মেয়ে রাস্তায় বার হলে তার সমস্ত শরীরটা যেন চোখ দিয়ে ছিঁড়ে খেতে চায় পুরুষরা। দুর্গতি মেয়ে বা গৃহবধূদের প্রতি তির্যক কটাক্ষ অজ্ঞান আমাদের সমাজ আজও পরিত্যাগ করতে পারেনি। বর্তমান অতিসভ্য সমাজের এই চরম লজ্জাজনক সত্য এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন কবি–

"রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর খসে পড়ছে আমার পোশাক
নগ্ন হয়ে যাচ্ছি, মাগো, কুঁজো হয়ে বসে পড়ছি শেষে
দু'হাতে জড়িয়ে নিচ্ছি দুই হাঁটু, ঢেকে নিচ্ছি মুখ বুক পেট
অলক্ষিত পিঠে এসে তীর বিঁধছে গোছাগোছা
মাগো দৃষ্টি বিঁধে যাচ্ছে যকৃতেও...হৃৎপিণ্ডে...ফুসফুসে..."

বর্তমান দিনে রাস্তা, অফিস, আদালত, বাস, ট্রেন কোথাও নারীরা সুরক্ষিত নয়। কখনও তাদের সরাসরি আঘাত করা হয়, কখনও ভোগ করা হয়। যখন ভোগের সুযোগ থাকে না তখন যেন দৃষ্টি দিয়ে তার সর্বস্ব হরণ করা হয়। পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি যেন চোখের আগুন দিয়েই সর্বাঙ্গে ভোগ করে নেয় নারীকে। সমাজের লেখকের এই কথাগুলো যে কতদূর সত্য তা বর্তমান সভ্যতা ও সমাজের দিকে তাকালে খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

নারীর কাছে পুরুষের অস্তিত্ব কতটা, পুরুষকে নারী কতটা ভালোবাসে, কতটা তার উপরে ভরসা করে? এইসব প্রশ্নের খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন **বিষাদ কবিতাগুচ্ছ** কাব্যের **'আবাহন'** কবিতায়। মানুষের সমাজ টিকে আছে নারী পুরুষের পারস্পরিক ভালোবাসা, প্রেম ও প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে। এইসব প্রেমের পরিণতি কতটা সুখকর হয় বা কতটা দুঃখের হয় তা বিচার করা বা যাচাই করার সুযোগ সবসময় থাকে না। সেই পরিসংখ্যান দেওয়াও একপ্রকার

দুঃসাধ্য। তবুও এই সত্য উপেক্ষা করার উপায় নেই। নারীর হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব, নারীর প্রেমময় হৃদয়ে পুরুষের অবস্থান কেমন তা বুঝে নিতে পারে একমাত্র নারীরাই। হৃদয়ের গোপন কথাকে হৃদয়ের মধ্যে পুষে নিয়ে সেটাকে প্রকাশ করতে পারে একজন নারী। যেমনটি প্রকাশ করেছে এই কবিতার নায়িকা-

"তুমি না থাকলে চারিদিকে শুধু শূন্যতা
কত মুহূর্ত কত শতাব্দী অনড় তারা"

সত্যিই নারীর হৃদয়ে পুরুষের অস্তিত্ব এমনই। নারী পুরুষকে হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার পর, নিজে নিজেই উপলব্ধি করে এই সম্পর্কের ভিতরে তবে একান্ত আবেগ থাকলেও নিশ্চয়তা সর্বাংশের নেই। তবুও নিজের সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও শেষ পর্যন্ত নারী পুরুষকেই তার শেষ আশ্রয়স্থল বলে মনে করে। অনুভূতি তীব্রতা এক্ষেত্রে একটাই পরিচয় থাকে যে, নিশ্চিত সর্বনাশের মধ্যেও নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে অন্য এক ধরনের আনন্দ তারা খুঁজে পায়। তারপর হৃদয়ের সব আগল উন্মুক্ত করে সকাতরে আবেদন জানায়-

"তুমি না থাকলে সব জনহীন, সব উজাড়
এস, থেকে যাও আমার সঙ্গে দিন দুচার"

প্রত্যেক নারীরই তাদের ভালোবাসার মানুষকে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলে মনে করে ও নিজেদের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেয় সেই পুরুষের কাছে। যদিও শেষ পর্যন্ত সে কতটা সুবিচার পায় তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মানবসভ্যতার মূল ভিত্তি নরনারীর পারস্পরিক সংসার বন্ধন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে একটা পুরুষ ও একটা নারী পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহ নামক সামাজিক এই প্রতিষ্ঠান আসলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ বৈবাহিক সম্পর্কে ভালোবাসা মমত্ববোধ বা পারস্পরিক সম্মানবোধের অস্তিত্ব থাকে না। পুরুষের ইচ্ছার কাছে মেয়েদের জীবনের সব সখ বলি দিতে হয়। বলি দিতে দিতে মেয়েদের জীবন দিনে দিনে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তারপরেও তারা মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করে। অথচ পুরুষসমাজ মেয়েদের এই আত্মত্যাগের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। সংসার জীবনে মেয়েদের এইরকম আত্মত্যাগের একটি সুন্দর ছবি কবি উপস্থাপন করেছেন **'এমন নৃশংস আয়োজন'** কাব্যের **'কয়েদির রাজনা ভুল'** কবিতায়। এখানে একটি সংসারের ছবি আঁকা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে গৃহবধূটি স্বামীর ভালোবাসা মঙ্গলার্থে মূল্য দেওয়ার জন্য জীবনের সব সত্তাকে, ভালোবাসার সব অনুভূতিকে স্বামীর পায়ের তলে দিয়েছে-

"মাথা থেকে ভূত নামিয়ে দাও
বলতে বলতে
মাথাই নামিয়ে রাখছি তোমার পায়ে"

নারীটি মাথা নামিয়ে রাখল স্বামীর পায়ে, কিন্তু তাতে কি ভালোবাসা পেল? নাকি স্বামী নামক সেই পুরুষটি বধূটির সর্বাংশ ভোগ করতে করতে হিংস্র পশুতে পরিণত হয়েছে? কবিতার শেষে কবি এইসব প্রশ্নের খুব কাঙ্ক্ষিত উত্তর দিয়েছেন-

"তুমি বড়ো বাচ্চা তুমি
আমার দৌড়ে ওঠা শিশু..."

স্ত্রীকে ভোগ করতে করতে পুরুষ কখন যে হিংস্র পশুতে পরিণত হয় তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। যে স্ত্রীকে সে ভোগ করছে, অন্তরে অন্তরে রক্তক্ষরণ হতে হতে সেই স্ত্রী শেষ পর্যন্ত জীবিত থেকেও মরে যায়, পচে যায় তার আত্মা। অথচ সেই জীবন্ত মৃতদেহ ভোগ করতেও পুরুষের কোনো দ্বিধা থাকে না। এই ক্ষেত্রে **'পৌরুষ ভক্ষ'** শব্দটি ব্যবহার করে কবি পুরুষদের হিংস্রতা ও নারীদের অসহায়ত্বকে দৃশ্যরূপ দিয়েছেন। এই সত্য সভ্যতার ইতিহাসে অতি প্রাচীন। বর্তমান দিনেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখনও সংসার পরিবেশে স্ত্রীরা প্রতিদিন শোষিত হচ্ছে, আর নির্বিকারে তাকে শোষণ করে চলেছে পুরুষ। আমরা জানি না কবে আমাদের এই দোষের অবসানের সমাপ্তি ঘটবে? তবে আমরা আশাবাদী। নিশ্চয়ই সেই শুভ দিনের উদয় হবে, যেদিন নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

প্রেমবধূ, দুর্গতি, সাধারণ শ্রমিক, দেহব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা পরিচয় নারীর থাকলেও, সবচেয়ে বড় পরিচয় তাদের মাতৃত্বে। মাতৃত্বের অনুভূতি ও দায়িত্ববোধ সমন্বিত পরিবেশে একটা নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। **'শান্তির শহরের মেয়ে'** কাব্যের **'পুজো'** কবিতায় এমনই একটি মাতৃত্বের গল্প কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পুজোর আগে মা এবং মেয়ের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন চলছে। মেয়েকে নতুন জামা দিতে পারেনি বলে মায়ের মন খারাপ, আর মায়ের নতুন শাড়ি হয়নি বলে মেয়ের মন খারাপ হয়ে আছে। মনখারাপের এই দোলাচলতার মাঝে একটু একটু করে পুজো কেটে যায়। বিসর্জনের দিন প্রতিবারই পুরনো পোশাক পরে কেটে যায় মা ও মেয়ের—

"বিসর্জনের দিন
আমরা দুজনে প্রতিবারই পরি
পুরনো একটা পাটভাঙা বিষাদ
ইস্তিরি করে যত্নে তুলে রাখা"

পুজোর আনন্দের সময়ে মেয়েকে নতুন জামা দিতে পারেনি বলে মায়ের হৃদয় কেঁদে ওঠে, আবার মায়ের নতুন শাড়ি হয়নি বলে মেয়ের হৃদয়ও কেঁদে ওঠে। পারস্পরিক এই যে হৃদয়ের কান্না তা একমাত্র নারী হৃদয়েই সম্ভব। এই অনুভূতির তল পাওয়া পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নারীর মাতৃত্ব সন্তানের আনন্দে পূর্ণতা পায়। সন্তানকে হাসিমুখে দেখতে মায়েরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি সে তো এখনো মা হয়ে ওঠেনি, তাহলে সে কেন মায়ের নতুন শাড়ি হয়নি বলে মন খারাপ করে রয়েছে? আসলে এটাই নারীদের অন্যতম অহংকার। ছোট্ট মেয়েটি মা হয়ে না উঠলেও তার ভিতরের মধ্যে মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি লুকিয়ে রয়েছে। যে কারণে মাকে পুরনো শাড়ি পরে থেকে হবে ভেবে তারও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ সমাজ জীবনের হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে মা ও মেয়ের এই মন ভার করার পালাক্রম অনন্ত সময় ধরেই চলতে থাকে। তবে এ কথাও সত্য মাতৃত্বের এই রোশনাই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে, মাতৃত্বের অহংকার নারীকে অহংকারী করে তুলেছে। তাদের অহংকার সজাগ থাকুক, মাতৃত্বের জোয়ারে পৃথিবী আরো রঙিন হয়ে উঠুক এই আমাদের প্রত্যাশা।

কোনো সন্দেহ নেই মন্দাক্রান্তা সেন একবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তাঁর কাব্যজগৎ বিভিন্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ। তবুও একজন মহিলা কবি হিসেবে তাঁর কাব্যে মেয়েদের কথা থাকবে বেশি করেই এটা খুবই স্বাভাবিক। আর ঘটেছেও ঠিক সেটাই। মন্দাক্রান্তা জীবনের অন্ধকার সত্যগুলোকে খুব সহজভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক জীবনযন্ত্রণাকে নাড়িগত অনুভূতির জায়গা থেকে অনুভব করেছিলেন। বিভিন্ন কবিতায় তাঁর সেই ভাবনার প্রকাশ আছে।

একবিংশ শতক অত্যাধুনিক জীবন সভ্যতার শতক। অত্যাধুনিক জীবনযাপন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে একালের জীবন পরিচালিত হচ্ছে। একথা স্বীকার করতেই হয় অত্যাধুনিক জীবনযাপনের অনেক সুফল আমরা উপভোগ করছি। তবে প্রদীপের পিছনে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনই অত্যাধুনিক জীবনদর্শনের মধ্যেও অনেক জটিলতা লুকিয়ে আছে। ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের গভীরে এখন বেশি করে বাসা বেঁধেছে একাকীত্বের যন্ত্রণা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই যন্ত্রণায় আহত হচ্ছে প্রতিটি মানবাত্মা। তবে বলতেই হয় একাকিত্বের যন্ত্রণাসহ জীবন জটিলতার অন্যান্য আরো সমস্যা পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে বেশি অংশে লক্ষ করা যায়। এই সত্য খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন। কবিতার মধ্যে তাঁর সেই উপলব্ধির প্রকাশও আছে বহুল পরিমাণে।

সভ্যতার প্রথমপর্বে আদি পর্বে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোনো ভেদরেখা ছিল না। সেদিনের বন্য পরিবেশে পুরুষ ও নারীরা কাঁধে কাঁধ রেখে জীবনযুদ্ধে অংশ নিত। কিন্তু সভ্যতার যত অগ্রগতি ঘটেছে ততই নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমা বাড়তে শুরু করেছে। একটা সময়ের পর নারী তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুরুষকে। কারণ নারীদের জীবনের যাবতীয় লাঞ্ছনা ও পরাধীনতার মূল কান্ডারি পুরুষরাই। এরপর শুরু হয় নারী-পুরুষের মধ্যে একটি ঠান্ডা লড়াই। এই আবহাওয়ায় আস্তে আস্তে পিছু হটতে থাকে নারীরা। দিনে দিনে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত হতে হতে একসময় তারাও রুখে দাঁড়ায়। প্রতিবাদ জানাতে থাকে জীবনের নানা অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে। সাহিত্য সেই অধ্যায় গুলোর একটি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকেই মহিলা কবিরা তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও এই ধারা চলতে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে পেয়েছি আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীদের মতো মহান শিল্পীদের। যাঁরা বিভিন্ন উপন্যাসের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন নিজেদের মতো করে। তাই বলতে হয় বাংলা সাহিত্যে নারীভাবনা ও নারীজীবনের প্রসঙ্গকথা আমরা পেয়েছি বহু আগেই। একবিংশ শতাব্দীতে সেই ধারার বিন্দুমাত্র ছেদ ঘটেনি। মন্দাক্রান্তা সেন এই সময়ের কবি হিসেবে সময়ের ভাবনাকে কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। তবে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা তসলিমা নাসরিনসহ অন্যান্য আরও অনেক মহিলা কবি-সাহিত্যিকদের মতো নয়। মন্দাক্রান্তা বিশেষভাবে দেখিয়েছেন সমস্যা গুলোকে। হৃদয়ের গভীরে কীভাবে নারীরা প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হয় সেই ক্ষতের ছবি অঙ্কন করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের মহিলা কবিদের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়ালেও মন্দাক্রান্তা কোথাও যেন তাদের থেকে পৃথক কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. আচার্য দেবেশ কুমার, ২০১০, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ, ১৯৫০-২০০০), কলকাতা, ইউনাইটেড বুক এজেন্সী, পৃ. ৫১৭।

আকর গ্রন্থ:

সেন মন্দাক্রান্তা, ২০১০, মন্দাক্রান্তা সেন শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Phn : 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in